ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. রেযাউল করিম

মোহাম্মদ নূরে আলম

মো: নেওয়াজুল মওলা

৩০ ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মু. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মোহাম্মদ নূরে আলম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মো: নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

তমালিকা পাল, রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বনখাত ও বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, আউটরিচ অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটিসহ বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের সহকর্মী মো. মাহ্‌ফুজুল হক এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের নিহার রঞ্জন রায় ও ফাতেমা আফরোজ এর প্রতি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরনো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

সূচি	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ	৫
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	৬-১০
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট	৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৮
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৮
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	৮
১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়: বন অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১১-২৮
২.১ বন অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও প্রেক্ষিত	১১
২.২ বন অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো	১৩
২.৩ বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২০
অধ্যায় তিন: বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা	২৯-৫০
৩.১ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ঘাটতি	২৯
৩.২ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ	২৯
৩.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব	৩২
৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়: বন অচিধদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম	৫০-৬৬
৪.১ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী ও উচ্চ পর্যায়ের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ	৫০
৪.২ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ	৫০
৪.৩ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ	৫৫
৪.৪ মাঠ পর্যায়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ	৬২
৪.৫ সরকারি বন উজাড়ের ঘটনায় যারা সম্পৃক্ত	৬৩
৪.৬ বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও ট্রাস্টফাণ্ড প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ	৬৪
৪.৭ নিরীক্ষা আপত্তির ধরন	৬৫
পঞ্চম অধ্যায়: সুপারিশমালা	৬৬-৭০
৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৬৬
৫.২ সুপারিশ	৬৬-৬৯
সহায়ক তথ্যপঞ্জী	৭০-৭৩
প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু কার্যকরি সংজ্ঞা	৭৪-৭৬
সংযুক্তি	৭৭-৮০

চিত্রের তালিকা

চিত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
চিত্র ১: বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	২২
চিত্র ২: ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সালে বন অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় (খাতওয়ারি)	২৪
চিত্র ৩: বন অধিদপ্তরের অংশীজন	২৭
চিত্র ৪: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত বনভূমির পরিমাণ	৪৮

সারণির তালিকা

সারণি	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৮
সারণি ২: বন অধিদপপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯
সারণি ৩: সুশাসনের নির্দেশক ও উপ-নির্দেশকসমূহ	১০
সারণি ৪: বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ ও মোট জনবল (সংক্ষেপিত)	২২
সারণি ৫: ২০১৪ -'১৫ থেকে ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট	২৪
সারণি ৬: এক নজরে করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালার সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	৩৩
সারণি ৭: বন অপরাধ সংক্রান্ত চলমান মামলার ধরণ ও সংখ্যা	৩৪
সারণি ৮: পদোন্নতি, বদলি/পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন	৫২
সারণি ৯: সিএজি'র অডিট আপত্তির ধরন	৬৫
সারণি ১০: সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ বণ্টন	৭৬
সারণি ১১: সংবাদপত্রে প্রকাশিত বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও শুদ্ধাচার চর্চায় ব্যত্যয়ের কিছু উদাহরণ	৭৮
সারণি ১২: গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকা ও কার্যালয়সমূহ	৭৯

সংযুক্তির তালিকা

সংযুক্তি	পৃষ্ঠা নম্বর
সংযুক্তি ১: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বনাঞ্চল	৭৭
সংযুক্তি ২ (সারণি ১২): গণমাধ্যমে প্রকাশিত বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও শুদ্ধাচার চর্চায় ব্যত্যয়সমূহ	৭৮
সংযুক্তি ৩ (সারণি ১৩): গবেষণায় তথ্য সংগ্রহরে জন্য নির্বাচিত এলাকা ও কার্যালয়সমূহ	৭৯
সংযুক্তি ৪: বন অধিদপ্তরের বর্তমান অর্গানোগ্রাম	৮০

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ, বনায়ন ও জলবায়ু অর্থায়ন অন্যতম।

ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় বন ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বন নীতিমালা, মহাপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল থাকা সত্ত্বেও বন ব্যবস্থাপনায় এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন হয় নি বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে বন রক্ষায় বন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য "বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

গবেষণায় সরকারি বনভূমির সুরক্ষা ও বনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে বন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সক্ষমতার কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগে বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। বনভূমি ও এর পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছভাবে প্রতিবেশবিরোধী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে বনভূমি ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদানের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। বেসামরিক ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণকাজে সংরক্ষিত বনভূমির জমি ঢালাওভাবে বরাদ্দ প্রদানসহ জবরদখলের ঘটনারোধে বন অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি, এড়িয়ে যাওয়া ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সক্রিয় না হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সর্বোপরি বন উজাড়, জমি বেদখল ও অবৈধভাবে বনভূমি বরাদ্দ কিংবা ব্যবহারের সাথে অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশ সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরণের উদাহরণ রয়েছে।

বন অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ ও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতির ঘটনায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টতা টেকসই বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- রিমোট সেনসিং) সম্প্রসারণ এবং এর সর্বোচ্চ ও কার্যকর ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা চালু না হওয়ার পেছনে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের একাংশের ভীতি এবং বাধা সৃষ্টি উদ্বেগজনক। এসব কারণে বন ও বনজ সম্পদের প্রধান রক্ষক হিসেবে অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ। গবেষণার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর এবং জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও সুশাসিত বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য অংশীজন এই গবেষণার সুপারিশের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে টিআইবি আশা করছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একাংশসহ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বনায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী স্থানীয় জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, তথ্যদাতাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা প্রয়োজনীয় নথি, তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে এ গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. রেযাউল করিম, মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো: নেওয়াজুল মওলা। তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে সহায়তা করেছেন তমালিকা পাল (গবেষণা সহকারী)। টিআইবি'র উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন) মু. জাকির হোসেন খান প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক শাহজাদা এম আকরাম এবং অন্যান্য সহকর্মীর মূল্যবান মতামত ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের কর্মীগণ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। টিআইবি'র উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান গবেষণাটির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা, কার্যকরতা তথা শুদ্ধচার বৃদ্ধির সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। প্রতিবেদনটির পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের যেকোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়:
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্থিতিস্থাপক রেখে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে বনভূমির উপস্থিতি অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বনভূমি সংরক্ষণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। উক্ত অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।[১] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি -১৫) বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা, বন উজাড়রোধ, বনভূমি পুনরুদ্ধার, অবক্ষয়িত বনের পুনবনায়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'দি কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডায়ভার্সিটি'র অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বনের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'জাতীয় বন নীতিমালা ২০১৬' তে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশের মোট আয়তনের ২০ শতাংশ বনায়ন ও ৫০ শতাংশ বৃক্ষ আচ্ছাদনের (ট্রি কভার কেনোপি) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বন অধিপ্তদরের সক্ষমতা ও সুশাসন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ ৪৬ লাখ ৫২ হাজার ২৫০ একর যা দেশের মোট আয়তনের ১২.৭৬ শতাংশ।[২] বন অধিদপ্তর ও রাজস্ব বিভাগ নিয়ন্ত্রিত অশ্রেণীভুক্ত বনসহ (১৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৬০৯ একর) বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৫৯ একর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৭ শতাংশ।[৩] তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১১ শতাংশ।[৪] তবে, বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণের কোনো গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান নাই। বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, বনভূমির অবস্থান ও বৈচিত্র্যভেদে বাংলাদেশের বন/বনাঞ্চলকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়[৫], যথা- ১. ক্রান্তিয় চিরসবুজ বন বা পাহাড়ি বন[৬]; ২. ক্রান্তিয় আর্দ্র পাতাঝরা বন বা শালবন[৭]; ৩. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন[৮]; ৪. সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন বা সৃজিত উপকূলীয় বন।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবরোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বনভূমির গুরুত্ব থাকলেও বিশ্বব্যাপি বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে বনভূমি উজাড় হওয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বর্ধিত জনসংখ্যার আবাস, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব দেশের ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলকে দিন-দিন ঝুঁকির মুখে ফেলছে।[৯] ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাসের পরিমাণ ছিল মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫০ একর কিলোহেক্টর।[১০] এছাড়া ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ০.২ শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।[১১]

ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। আর্ন্তজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স' (সিআরআই) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির

---

[১] তথ্যসূত্র: অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: https://rb.gy/unjpyq, সর্বশেষ ভিজিট: ২৯ নভেম্বর ২০২০।

[২] তথ্যসূত্র: 'জেলা ভিত্তিক গেজেটভূক্ত বনভূমির হাল নাগাদ তথ্যাদি (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)', বন অধিদপপ্তরের ওয়েব সাইট হতে ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/hxCL9, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ নভেম্বর ২০২০।

[৩] প্রাগুপ্ত।

[৪] ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স (এফএও), গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫, ডেস্ক রেফারেন্স, রোম, ২০১৫), পৃষ্ঠা ৩, বিস্তারিত দেখুন- http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf , সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ অক্টোবর ২০১৯।

[৫] সংযুক্তি ১ (বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন/বনাঞ্চল)।

[৬] চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার পাহাড়ি অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেলার পাহাড়ি এলাকায় এই বনভূমি দেখা যায়। মূলত পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক বলে এই বন 'পাহাড়ি বন' নামে পরিচিত।

[৭] গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংসহ, দিনাজপুর ও কুমিল্লা জেলায় শাল (শোরিয়া রোবাসটা) গাছের প্রাধান্য থাকায় এই বন শালবন নামে পরিচিত। এই বন মূলত দু'ধরনের, যথা- সৃজিত রাষ্ট্রীয় বন ও সৃজিত বেসরকারি বন বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন।

[৮] উল্লেখ্য, সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকার চিরসবুজ বন সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয় ও এর গাছে বায়ুমূল রয়েছে যা ম্যানগ্রোভ ও প্যারাবন নামেও পরিচিত।

[৯] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১০] গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (জিএফডব্লিউ), *কান্ট্রি ফরেস্ট ডাটা*, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/358Xr4i, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০।

[১১] ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দি ইউনাইটেড নেশন্স, *গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫*, ডেস্ক রেফারেন্স, রোম, বিস্তারিত দেখুন: www.fao.org/publications, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯।

বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে নবম স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।[১২] দেশের অরক্ষিত উপকূলীয় এলাকার বনভূমি, পাহাড়ের নিবিড় বনে মানুষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, সুন্দরবনকে ঘিরে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানা স্থাপন, সর্বোপরি বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতির কারণে দেশের বনভূমি হুমকির সম্মুখীন। এছাড়াও অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন, জবর দখল, কৃষিজমির জন্য বন উজাড়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সরকারিভাবে বনভূমি বরাদ্দ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেশের অবশিষ্ট বনভূমি ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[১৩]

বন অধিদপ্তর দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে বন বিভাগ[১৪] ও ১৮৬৪ সালে 'প্রভিন্সিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস'[১৫] প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং পরে ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়।[১৬] 'বাংলাদেশ সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস' ১৯৮০ সালে 'বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস'ভুক্ত হয়। সরকারি বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাসহ বন বিষয়ক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। বর্তমানে দেশের ১২.৭৬ শতাংশ ভূমির নিয়ন্ত্রক হলো বন অধিদপ্তর।

বন ও বনজ সম্পদের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক হিসেবে বন অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশের বন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার পেছনে বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ভূমিকাই প্রধান।[১৭] প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধে অদক্ষ ও ভুল ব্যবস্থাপনা[১৮], নীতিনির্ধারণী পর্যায় ও অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা[১৯]; বন ব্যবস্থাপনার অকার্যকরতা[২০]; বন কর্মকর্তা-ব্যবসায়ী-স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ[২১]; আবাসন ব্যবসা ও কৃষির জন্য বন উজাড়[২২]; বন সংরক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি[২৩], সংরক্ষিত বনে সামাজিক বনায়ন ও বন উজাড় ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস[২৪], ইত্যাদি তথ্য আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি, যেমন- জনবল সংকট, লজিস্টিকস ও কারিগরি স্বল্পতা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ঘাটতি, অবকাঠামোগত ঘাটতি, অদক্ষতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[২৫] এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডে সততা ও সুনীতি চর্চার ঘাটতি সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে অর্থের লেনদেন ও অনৈতিক যোগসাজশ, প্রকল্পের কেনাকাটায় সরকারের ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ না করা, ঘুষ লেনদেন ও অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে পছন্দের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া, ইজারাদার ও সুবিধাভোগী নিয়োগে আর্থিক লেনদেন ও প্রভাব বিস্তার, বন উজাড়কারী ও বনভূমি দখলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অনৈতিক যোগসাজশের মাধ্যমে বন উজাড় ও জবরদখলে সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

---

[১২] ডেভিড একস্টেইন, ম্যারি-লিনা হাটফিল্স এবং মায়েক উইংস, "দি গ্লোবল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ফর ২০১৭", *জার্মান ওয়াচ* (২০১৯), জার্মানি. বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/acoqY, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ মে ২০২০।

[১৩] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১৪] তবে বৃটিশ ভারতে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তৎকালীন বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার বনাঞ্চল হতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মালিকানাধীন জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও রেলওয়ের স্লিপার তৈরির কারখানার মূল উপাদান তথা কাঠ নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

[১৫] অপর দু'টি হলো- 'ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস' ও এবং 'সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস'।

[১৬] এই মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম হলো- 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'।

[১৭] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১৮] এন জি কিবরিয়া, এস এ রহমান, এ ইমতিয়াজ এবং টি সুন্দরল্যাণ্ড, "এক্সটেন্ট এন্ড কনসিকোয়েন্সেস অব ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন: সাকসেসিভ পলিসি অপশন্স ফর বাংলাদেশ", *জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি*, বি১ (২০১১), পৃষ্ঠা ৩১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2sL49jJ, সর্বশেষ ভিজিট: ২২ জানুয়ারি ২০২০।

[১৯] মোহাম্মদ সহিদ হোসেন চৌধুরী, নাহিদ নাজিয়া, শিজেইউকি ইজুমহয়ামা, নূর মোহাম্মদ এবং মাসো কোয়কি, "পেটারনস অ্যাণ্ড এক্সটেন্ট অব থ্রেটস টু দ্যা প্রোজেক্টেড এরিয়াজ অব বাংলাদেশ: দি নিড ফর এ রিলক এট কনজারভেশন স্ট্রেটিজিজ", *পার্কস, ভল্যুউম ২০.১* (২০১৪), বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/fiFGS, সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ জানুয়ারি ২০২০।

[২০] A. Z. M. Manzoor Rashid, Donna Craig, Sharif Ahmed Mukul and Niaz Ahmed Khan, "A journey towards shared governance: status and prospects for col-laborative management in the protected areas of Bangladesh", বিস্তারিত দেখুন: https://rb.gy/wjynx4, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০.

[২১] Md. Habibur Rahman, Md. Abu Sayed Arfin Khan, Bishwajit Roy, Most. Jannatul Fardusi, "Assessment of Natural Regeneration Status and Diversity of Tree Species in the Biodiversity Conservation Areas of Northeastern Bangladesh", *Journal of Forestry Research* (2011) 22(4), পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৫৯, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/rzEY8, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০.

[২২] Muhammed, N., Koike, M., Haque, F. and M.D. Miah, "Quantitative assessment of people-oriented forestry in Bangladesh: A case study in the Tangail Forest Division", *Journal of Environmental Management*, ভল্যুম ৮৮ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৮৩-৯২.

[২৩] Kazi Kamrul Islam Islam and N Sato, "Deforestation, land conversion and illegal logging in Bangladesh: the case of the Sal (*Shorea robusta*) forests," *iForest - Biogeosciences and Forestry*, ভল্যুম ৫, ইস্যু সংখ্যা ৩ (২৫ জুন ২০১২), পৃষ্ঠা ১৭১-১৭৮, বিস্তারিত দেখুন: https://doi.org/10.3832/ifor0578-005, সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ নভেম্বর ২০২০.

[২৪] ফিলিপ গাইন, দ্যা লাস্ট ফরেস্টস অব বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৩৭।

[২৫] সংযুক্তি ২ (গণমাধ্যমে প্রকাশিত বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও শুদ্ধাচার চর্চায় ব্যত্যয়সমূহ)।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় তিন শতাংশ ও শ্রমশক্তির দুই শতাংশের উৎস হলো বনভূমি।[২৬] দেশের প্রায় ৫.৮৩ মিলিয়ন মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনের ওপর নির্ভরশীল।[২৭] বাংলাদেশে বন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের প্রায় ৪০ শতাংশ নারী।[২৮] জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বনভূমির সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও এর সুরক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরূপভাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বনের ভূমিকা অনন্য, সুন্দরবনের সবুজ বেষ্টনী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। বিগত কয়েকটি প্রলয়ঙ্কারী ঝড় থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে সুন্দরবন। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বোচ্চ ঝুঁকির দেশ হিসেবে বনাঞ্চলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, যা অনেকটা নির্ভর করে বন অধিদপ্তরের ওপর, অথচ বনের জমিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও স্থাপনা নির্মাণের ফলে বন সংকোচন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় বন নীতি ২০১৬ ও মহাপরিকল্পনায় (বন মহাপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৬ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০) বন রক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাত অন্যতম। টিআইবি বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৮ সালে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত 'বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণায় মূলত বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে।[২৯] বন অধিদপ্তরকে বন রক্ষায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও সুশাসিত বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. বন অধিদপ্তরের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;

২. বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং

৩. বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্যের উৎস

এই গবেষণা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য মূলত প্রত্যক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে পরোক্ষ উৎস হতেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৪.১.১ প্রত্যক্ষ তথ্য: এই গবেষণাটি মূলত মাঠ হতে সংগৃহীত তথ্য-নির্ভর। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত বর্তমান ও সাবেক ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের বিষয়, তথ্যদাতা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্যদাতার ধরনভেদে যেসব টুলস্ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

পদ্ধতি	তথ্যদাতা	টুলস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (১৩০টি)	▪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ	গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্য ও তথ্যদাতার ধরণ এবং তথ্য সংগ্রহস্থলের প্রেক্ষিতভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট

[২৬] *বাংলাদেশ ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি* (২০১৬-২০৩১), বন অধিদপ্তর (সেপ্টেম্বর ২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৩০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2tg1z5d, সর্বশেষ ভিজিট: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

[২৭] *হাউজহোল্ড বেইজড ফরেস্ট্রি সার্ভে* ২০১১-১২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃষ্ঠা ১২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2SDLJMj, সর্বশেষ ভিজিট: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

[২৮] ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দি ইউনাইটেড নেশন্স, *গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫*, ডেস্ক রেফারেন্স, রোম, পৃষ্ঠা ২৩, বিস্তারিত দেখুন: http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf, Accessed on 31 December 2019.

[২৯] মনজুর-ই-খুদা, *ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকউন্টেবিলিটি ইন ফরেস্ট কনজারভেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট: প্রবলেমস এন্ড ওয়ে আউট*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (১৪ আগস্ট ২০০৮), বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/rp_Study_on_Forest.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ নভেম্বর ২০২০।

পদ্ধতি	তথ্যদাতা	টুলস
	▪ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক ও বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী, ইত্যাদি	
দলীয় আলোচনা (৬টি)	▪ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী ▪ বন-নির্ভর ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগী	চেকলিস্ট ও গাইডলাইন
পর্যবেক্ষণ (৬০টি বন কার্যালয়)	▪ প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, ৭টি বন সংরক্ষকের দপ্তর, ১৫টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর, ১৮টি ফরেস্ট রেঞ্জ কার্যালয়, ১৫টি বিট অফিস এবং ৪টি অন্যান্য (চেক স্টেশন, ক্যাম্প ও ফাঁড়ি)	চেকলিস্ট/ গাইডলাইন

১.৪.১.২ পরোক্ষ তথ্য: গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বন ও বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইট, ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎসের তথ্য আধেয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪.২ তথ্য সংগ্রহের স্থান

এই গবেষণায় বন অধিদপ্তরের কাজের ধরন, সম্পাদিত কাজের গভীরতা, এলাকা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা, কার্যকরতা বিষয়ে নিবিড় ধারণা পাওয়ার জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল স্তরের কার্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিয়ে মোট ৬০টি কার্যালয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ২: বন অধিদপপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

বন কার্যালয়/দপ্তরের ধরন	মোট সংখ্যা	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কার্যালয়ের সংখ্যা
১. প্রধান বন সংরক্ষক এর দপ্তর/সদর দপ্তর	১	১
২. বন সংরক্ষক এর দপ্তর	১০	৭
৩. বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর	৪৪	১৫
৪. রেঞ্জ অফিস	২৫৫	১৮
৫. বিট অফিস	৬৭২	১৫
৬. ফাঁড়ি/ ক্যাম্প[৩০]	-	৪
৭. চেক স্টেশন[৩১]	-	
৮. সোশ্যাল ফরেস্ট্রি নার্সারি এন্ড ট্রেনিং সেন্টার	৯৮	-
৯. সোশ্যাল ফরেস্ট্রি প্ল্যান্টেশন সেন্টার	৩৪১	-
১০. ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলোজি ইনস্টিটিউট	৩	-
১১. বন একাডেমি	১	-
মোট (সংখ্যায়)	-	৬০টি

সূত্র: প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর; তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১৬.১১.২০২০

গবেষণায় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে জানতে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে বর্তমান গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়। এই গবেষণায় প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর ও বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল স্তরের কার্যালয় বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত দু'টি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, যথা- বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বনের প্রকারভেদ[৩২] এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বন অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোর ধরন। এই দুটি দিক বিবেচনায় বন অধিদপ্তরের সদর

[৩০] প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর হতে তথ্য পাওয়া যায় নি।

[৩১] প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর হতে তথ্য পাওয়া যায় নি।

[৩২] বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের (যেমন- বন ও এর গাছপালার বাহ্যিক চেহারা, গাছের গঠন ও গাছপালার এককে বা প্রাধান্য) ভিত্তিতে বাংলাদেশের বনভূমিকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা- ১. ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন (ট্রপিক্যাল ওয়েট এভারগ্রিণ ফরেস্ট): চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার পাহাড়ি অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেলার পাহাড়ি এলাকায় এই বনভূমি দেখা যায়। মূলত পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক বলে এই বন 'পাহাড়ি বন' নামে পরিচিত; ২. ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন (ট্রপিক্যাল সেমি-এভারগ্রীণ ফরেস্ট): এই বনভূমি সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুরের পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায়। এটি চিরহরিত হলেও পত্রপতনশীল; ৩. ক্রান্তীয় আর্দ্র পত্রমোচী বন (ট্রপিক্যাল মোয়েস্ট ডেসাইডুয়াস ফরেস্ট): শাল (শোরিয়া রোবাসটা) গাছের প্রাধান্য থাকায় এই বন সাধারণত 'শালবন' নামে পরিচিত। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংসহ, দিনাজপুর ও কুমিল্লা জেলায় এই বনভূমির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়; ৪. জোয়ারবিধৌত বন (টাইডাল ফরেস্ট): সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকার এই চিরসবুজ বনভূমি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয় এবং এর গাছে বায়ুমূল রয়েছে যা ম্যানগ্রোভ বা প্যারাবন নামেও পরিচিত; ৫. সৃজিত/কৃত্তিম বন (প্ল্যান্টেশন ফরেস্ট): এই বন মূলত দুই ধরনের- ক. সৃজিত রাষ্ট্রীয় বন, খ. সৃজিত বেসরকারি বন (সূত্র: বন ও বনবিজ্ঞান,

দপ্তরের বাইরে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, চেক স্টেশন, ফরেস্ট ক্যাম্প, ফাঁড়ি, ইত্যাদি কার্যালয় ও এসব কার্যালয়ে কর্মরত কর্মীদের তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের নির্বাচিত কার্যালয়গুলো মূলত ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন ও ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন বা পাহাড়ি বন (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ওকক্সবাজার), ক্রান্তীয় আর্দ্র পত্রমোচী বন বা শালবন (গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ), জোয়ারবিধৌত বন বা ম্যানগ্রোভ বন (খুলনা ও পটুয়াখালী), এবং সৃজিত বা কৃত্তিম বন (ঢাকা ও টাঙ্গাইল) সংশ্লিষ্ট (সংযুক্তি ৩ দেখুন)। নির্বাচিত কার্যালয়গুলোর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও তা হতে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগের আওতাভুক্ত খুলনাস্থ অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একাংশের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

১.৪.৩ বিশ্লেষণ কাঠামো

এ গবেষণার তথ্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত ছয়টি নির্দেশক হলো- ছয়টি সূচকের আলোকে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি ৩ দেখুন)।

সারণি ৩: সুশাসনের নির্দেশক ও উপ-নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক
সক্ষমতা	▪ আইনি: সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি
	▪ প্রাতিষ্ঠানিক: আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	▪ তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
জবাবদিহিতা	▪ তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	▪ বন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
সুরক্ষা	▪ বনভূমি সুরক্ষা ও জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার
দুর্নীতি ও অনিয়ম	▪ দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

১.৪.৪ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়

গবেষণার তথ্য ২০১৯ সালের জানুয়ারি হতে ২০২০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

১.৪.৫ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণায় অনুসরণকৃত পদ্ধতি যেমন - একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে 'ডাটা ট্রায়াঙ্গুলেশন' করে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর (যা প্রধান কার্যালয়/সদর দপ্তর হিসেবেও পরিচিত) ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কার্যালয়ের কর্মী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট হতে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ ও সুনীতি চর্চা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহকালে একই স্তরের কার্যালয়ের ইতোপূর্বের তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্যের মিল-অমিল, সামঞ্জস্যতা, সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের চারজন গবেষণা কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এই গবেষণার সকল তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করেছে।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ বন সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় বন অধিদপ্তর কতটা সক্ষম সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। প্রতিবেদনে কোনো বিষয়ে সাধারণীকরণ করা হয় নি। তবে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য বন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের সকল কর্মী ও অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বন অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বন অধিদপ্তর এবং বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম সম্পর্কিত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলাপিডিয়া- বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2SRS1Is, সর্বশেষ ভিজিট: ২ অক্টোবর ২০১৯)। এছাড়া সোয়াম্প ফরেস্ট (রাতারগুল) আরো এক ধরনের বন রয়েছে যা দেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় দেখা যায় যা জলাভূমির বন নামেও পরিচিত। এই বনের ব্যবস্থাপনা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চার ধরনের বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার মতো হওয়ায় এটিকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
বন অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ বন অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও প্রেক্ষিত

মূলত জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও রেলওয়ের স্লিপারের কাঠ সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যে ১৮৬২ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে ১৮৬৭ সালে বৃটিশ ভারতে তিনটি বন বিভাগ ও তিনটি ফরেস্ট সার্ভিস, যেমন- 'প্রভিনসিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস' এবং 'সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস' চালু করা হয়।[৩৩] জার্মান ফরেস্টার স্যার ডায়েট্রিচ ব্রান্ডিসকে ১৮৬৬ সালে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্টস' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তৎকালীন বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার 'কনজারভেটর অব ফরেস্ট' হিসেবে ১৮৬৪ সালে এমবি এন্ডারসনের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।[৩৪] সংরক্ষিত ও রক্ষিত বন সংক্রান্ত প্রথম আইন ১৮৬৫ সালে প্রণীত 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট'।[৩৫] এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ সালে একজন 'অ্যাসিসট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট' নিয়োগ দেওয়া হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মোট ৬ হাজার ৮৮২ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে ৫ হাজার ৬৭০ বর্গ মাইল এলাকাকে সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩৬] ১৮৭১ সালে সরকারিভাবে প্রথম বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮৭২ সালে স্যার উইলিয়াম স্লিচ 'কনজারভেটর অব ফরেস্ট' হিসেবে নিয়োগ পায়। তার অধীনে পাঁচটি বন বিভাগ ছিল- ঢাকা, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর, কোচ বিহার ও আসাম। বেঙ্গল ফরেস্ট ডিভিশনকে দার্জিলিং, পালামৌ, জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম- এই পাঁচটি বন বিভাগে বিভক্ত করে ১৮৭৬ সালে পুনর্বিন্যাস করা হয়। প্রথম বননীতি প্রণীত হয় ১৮৯৪ সালে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এর জেলাগুলোতে বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯১২ সালে।[৩৭] এটি বাংলাদেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে বন ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের প্রথম উদ্যোগ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বেঙ্গল ও আসাম বন বিভাগদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৩৮] ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির পর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, সুন্দরবন এবং আসাম বন বিভাগের একটি অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে আসে। পাকিস্তান হওয়ার পর ফরেস্ট সার্ভিসকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন করা হয় এবং ফরেস্ট সার্ভিসকে 'ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস' এবং 'সাব অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস' নামে নামকরণ করা হয়।[৩৯] ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি 'ওয়ার্কিং প্ল্যান' তৈরি করা হয়, যার আলোকে পরবর্তীতে 'ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম 'ফরেস্ট ইনভেন্টরি' করা হয় এবং কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বাঁশ ব্যবহার লাগিয়ে কাগজ তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়।

বন্যপ্রাণী বনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে ১৯৬০ সালে সুন্দরবনে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। তবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বন ও বনজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বনাঞ্চলের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক বনের বাইরেও নতুন বন সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম বন সম্প্রসারণে পরিকল্পিত বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।[৪০] তবে বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদের ওপর তখন পর্যন্ত কোনো নিবিড় গবেষণা ছিল না। এর

---

[৩৩] Indian Forest Service (History), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. http://ifs.nic.in//content/Index/?qlid=2009&Ls_is=4093&lngid=1, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ নভেম্বর ২০১৯; তবে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বন বিভাগ ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, বিস্তারিত দেখতে: http://www.bforest.gov.bd/site/page/652474bd-a9c0-4bfb-88f9-c235653f1b17/-, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ নভেম্বর ২০১৯

[৩৪] প্রাগুপ্ত।

[৩৫] Kamal, A., M. Kamaluddin, and M. Ullah. 1999. Land Policies, Land Management and Land Degradation in the HKH Region: Bangladesh Study Report. ICIMOD, Kathmandu, Nepal. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.), পৃষ্ঠা ১১৬, বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf.

[৩৬] Millat-e-Mustafa, M. 2002. A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends, Institute for Global Environmental Strategies, পৃষ্ঠা ১১৬, বিস্তারিত দেখুন: -------------------, সর্বশেষ ভিজিট: ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

[৩৭] প্রাগুপ্ত।

[৩৮] বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/652474bd-a9c0-4bfb-88f9-c235653f1b17/-, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯.

[৩৯] A.N.M.A. Wadud, 'Need for change in Forest Act 1927', *Review Paper* No. 111, Institute of Forestry, University of Chittagong, Bangladesh, 1989 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.), পৃষ্ঠা ১১৭, বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

[৪০] প্রাগুপ্ত।

পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালে কানাডিয়ান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বনাঞ্চলের ভূ-সম্পদের বন জরিপ সম্পাদন করা হয়।

উপকূলীয় এলাকাসমূহে নতুন জেগে উঠা চরগুলো রক্ষা ও স্থায়ীরূপ দেওয়াসহ প্রাকৃতির ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলকে রক্ষার জন্য উপকূল জুড়ে 'গ্রীনবেল্ট' তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম উপকূলীয় বনায়ন তথা ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।[৪১] এছাড়াও ১৯৭৭ সালে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪' অনুসারে সুন্দরবনের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে মোট ৩২,৪০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন 'ইউনেস্কো'[৪২] এই তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়রাণ্যকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা দেয়।[৪৩]

১৯৭৯ সালে স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে চট্টগ্রামের বেতাগী ও পোমরাতে 'সামাজিক বনায়ন' কার্যক্রম শুরু হয়।[৪৪] এছাড়া ১৯৮১-১৯৮২ আর্থিক বছর থেকে উত্তরবঙ্গে সরকারি জমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর সাতটি জেলায় কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। সামাজিক বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, বনজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, লভ্যাংশ বণ্টন ও পুনঃবনায়নসহ সকল কার্যক্রমে স্থানীয় দরিদ্র জনগণ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করে বনায়ন কার্যক্রম বেগবান করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।[৪৫] 'কমিউনিটি ফরেস্ট্রি'র অধীনে থানা পর্যায়ে একটি কমিটি করা হয়, যাদের কাজ হলো কমিউনিটিগুলোকে উৎসাহিত করতে প্রণোদনা দিয়ে বন রক্ষা করা। এর ফলে প্রায় ৮৬টি উপজেলায় কমিউনিটি ফরেস্ট্রির কার্যক্রম শুরু হয়। একে থানা বনায়ন হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত 'ওয়াইল্ডলাইফ প্রিজারভেশন' নিয়ে বন বিভাগের কোনো কার্যক্রম না থাকলেও বনের সাথে সাথে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা বিষয়টি আলোচনায় ছিল। এর ধারাবাহিকতায় বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য ১৯৭৪ সালে বন আইনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (পিআরএমপি) ২০০০ সালে শুরু হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদেরকে রাজস্ব খাতে নিয়ে আসা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বনায়নকে ছড়িয়ে দেওয়া এই পরিকল্পনার অংশ ছিল। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে ফাঁকা স্থানে তথা- রাস্তা ও রেললাইনের পাশে সামাজিক বৃক্ষায়ন শুরু হয়, পরে তা সরকারি বনভূমির বেদখল হওয়া জমিতে বনায়ন কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়নের বিধিমালা পাশ হয়। যেখানে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে ১০ থেকে ১২ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়ে সরকারি খরচে বনায়ন করে এবং লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এ বিধিমালার অধীনে সামাজিক বনায়নের অংশীদারগণের লভ্যাংশ বণ্টন কীভাবে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার ভূমির ওপর নির্ভর করে এই বণ্টন নির্ধারণ করা হয়, যেমন- রেলওয়ের জমিতে সামাজিক বনায়ন হলে রেলওয়েও একটা অংশ পাবে। আবার সরকারের বন ভূমিতে বনায়ন হলে সেখানে লভ্যাংশের বণ্টন অন্যরকম হবে। পূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বনায়নের লভ্যাংশও স্থানীয় কমিউনিটিকে দেওয়া হতো। তবে লভ্যাংশ বণ্টনের জন্য কোনো নীতিমালা ছিল না। মূলত বন বিভাগ ঠিক করতো সকল অংশীজনের মধ্যে কে কত অংশ পাবে, যা সামাজিক বনায়নের আইন দ্বারা নির্ধারিত।

১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার রুল' প্রবর্তন হওয়ায় 'বাংলাদেশ সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস'কে (বিসিএস-বন) ক্যাডারভুক্ত করা হয়।[৪৬] তবে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত হলেও বন বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে যায়। ১৯৮৯ সালে 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' সৃষ্টির পর বন বিভাগ এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে আসে।[৪৭] ১৯৯৪ সালে দেশে প্রথম বননীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিমালার আলোকে একই বছর দেশে প্রথম বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের গাছ একই জায়গা থেকে ক্রয় ও পরামর্শ পাওয়ার সাথে-সাথে জনগণের মধ্যে বন, বনায়ন ও বৃক্ষরোপনের সচেতনতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৪৮] পরবর্তীতে ২০০৪ সালে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'তে বনায়ন কর্মসূচির অধীনে 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪' প্রণয়ন করা হয়, যা আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করে ২০১১ সালে 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১০' প্রণয়ন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি নিয়ে বৈশ্বিকভাবে আলোচনা ও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের তাগিদ অনুভূত হয় এবং বন ও বনায়নের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের নিবিড় সম্পর্ক আলোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'পরিবেশ,

---

[৪১] বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/652474bd-a9c0-4bfb-88f9-c235653f1b17/-, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[42] ইউনাইডেট নেশন্স এডুকেশন, সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন বা ইউনেস্কো।

[৪৩] বিস্তারিত দেখুন: https://whc.unesco.org/en/list/798, সর্বশেষ ভিজিট: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৪৪] বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/652474bd-a9c0-4bfb-88f9-c235653f1b17/-, সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

[৪৫] প্রাগুপ্ত।

[৪৬] প্রাগুপ্ত।

[৪৭] প্রাগুপ্ত

[৪৮] মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী, সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই; নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই, স্মরণিকা, জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা (২০১৮), বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ১৫।

বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়' নাম রাখা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বন অধিদপ্তর।

২.২ বন অধিদপ্তরের আইনি কাঠামো (নীতি, আইন, বিধি ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

বাংলাদেশের বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনায় গৃহীত আইন ও নীতিমালা সমূহ ইতিহাসের বিভিন্ন সময় সংঘটিত বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১৮৬৫ সালে বন আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৯৪ সালে প্রথম বননীতি গ্রহণ করা হয়, যা পরে ১৯০৪ সালে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। ১৮৯৪ সালে ঘোষিত বননীতিতে বনে বসবাসকারী ও স্থানীয় জনগণের স্বার্থ না দেখে তাদের জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ বনকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।[৪৯] অপরদিকে, বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরের সুযোগ রাখার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ অপেক্ষা কৃষিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন ভারতবর্ষে কৃষি জমি বাড়ানোর অভিপ্রায়ে ব্যাপকভাবে বন উজাড় হয়।[৫০] এই বন আইন ও নীতিমালায় বন সংরক্ষণ, সুরক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।[৫১]

২.২.১ সাংবিধানিক স্বীকৃতি

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৫২] বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' এর আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা বন, বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

২.২.২ নীতিমালা

২.২.৩ 'জাতীয় বননীতি ২০১৬'[৫৩]

বাংলাদেশে প্রথম বননীতি ঘোষণা করা হয় ১৯৭৯ সালে।[৫৪] এই বন নীতিতে বন সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা দ্বারা বনসৃজনসহ বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, কাঠভিত্তিক আধুনিক শিল্প-কারখানা স্থাপন, এবং শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে এই নীতিমালায় বনে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার বিষয়কে গুরুত্বসহকারে দেখা হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৪ সালের সংশোধিত জাতীয় বন নীতিতে শুধু বন সম্পর্কিত কাজে বনভূমির ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণসহ ২০১৫ সালের মধ্যে বন আচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট ভূ-খণ্ডের ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই নীতিমালায় বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের সর্বশেষ বননীতিতে ('জাতীয় বননীতি ২০১৬'[৫৫]) সরকারি বনভূমির কঠোর সংরক্ষণ, বনের এলাকা সম্প্রসারণ, অবক্ষয়িত বনাঞ্চলে বন সমৃদ্ধকরণসহ বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই বননীতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হলো: বনের উপর বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য সকল প্রকার অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম এবং বনের বাইরে (অফ-ফরেস্ট) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা; রক্ষিত এলাকা ও অন্যান্য আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করা; বন বাস্তুতন্ত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করা; এবং নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাভূমির জল-বিভাজিকা (ক্যাচমেন্ট) চিহ্নিত করা, কঠোর প্রাকৃতিক রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা, ইত্যাদি। তবে এই নীতিমালায় বনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার বিষয়কে গুরুত্বসহকারে দেখা হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৪৯] Laskar Muqsudur Rahman, History of Forest Conservation in Indo-Bangladesh. Aranaya 2(2) (1993), পৃষ্ঠা ১৫ ২১-২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.researchgate.net/publication/316854482_History_of_Forest_Conservation_in_Indo-Bangladesh, সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৫০] Khan, N.A. 2001. RETA 5900, Bangladesh Country Case Study (Final Report). AWFN, ADB, Manila, Philippines. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.), পৃষ্ঠা ২৯, বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[৫১] প্রাগুপ্ত।

[৫২] "১৮ক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-41501.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

[৫৩] *জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া)*, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫৪] ১৮৯৪ সালে বৃটিশ-ভারতে প্রথম বননীতি প্রণীত হয়।

[৫৫] *জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া)*, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২.৪ 'বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬'[৫৬]

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও জনঅংশগ্রহণ- এই দু'টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে দু'টি বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বন খাতের 'প্রথম বন মহাপরিকল্পনা ১৯৯৬-২০১৫' এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০১৫ সাল দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করা।[৫৭] তবে এই লক্ষ্য অর্জিত হয় নি।[৫৮] পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলাসহ বৈশ্বিক উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে ইতোপূর্বেকার গৃহীত মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করে 'বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬' প্রণয়ন করা হয়। এর লক্ষ্যসমূহ হলো[৫৯]- দেশের ২০ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা বনায়নের আওতায় আনা যার সর্বনিম্ন বৃক্ষ আচ্ছাদন (ক্যানোপি ডেনসিটি) হবে ৫০ শতাংশ; অবশিষ্ট প্রাকৃতিক শাল, পাহাড় ও ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ; 'বন প্রতিষ্ঠানসমূহকে'[৬০] (যেমন- বন অধিদপ্তর) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম ও শক্তিশালীকরণ; বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ দৃঢ়করণ, ইত্যাদি। 'বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭ থেকে ২০৩৬' এ বন সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা হলো- চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে সকল শূন্যপদ পূরণ, নিয়মিত কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তন, এক বছরের মধ্যে অবকাঠামো, যানবাহন, ইত্যাদি সুবিধাদির চাহিদা নিরূপন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; ক্যাডার ও নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব নিরসনে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন; বন ও বন্যপ্রাণী আইন-বিধিমালাসমূহ হালনাগাদ ও প্রতিস্থাপন; স্বাধীন বনায়ন সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্ভাব্যতা অন্বেষণ; সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিতকরণ, অবশিষ্ট শাল ও পাহাড়ী বন রক্ষায় এলাকা-ভিত্তিক সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণসহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে পুনবনায়ন, বনায়নে বেসরকারি উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদান, অবৈধ দখল ও বন উজাড়ের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি।

২.২.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়[৬১] বন উপ-খাত

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হলো - বন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন; বন ও বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ; বনের ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ ও সুরক্ষা; বন্যপ্রাণী সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি।[৬২] বন খাতে এসব লক্ষ্য অর্জনে অনুসৃত নীতি ও কৌশলগুলো হলো- প্রাকৃতিক বনের গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখা; জনঅংশগ্রহণে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন; বনাঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের মাধ্যমে বেআইনি দখল প্রতিরোধ; সকল সংরক্ষিত এলাকায় (পিএ)-তে যৌথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করা; উপকূলের ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে বনায়ন ও পুনবনায়ন; সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ মোট বনভূমির ১৫ শতাংশে উন্নীতকরণ; বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও অনুপযোগী উদ্ভিদ, যেমন- ইউক্যালিপটাস গাছ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা; উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিপন্ন ও হুমকির সম্মুখীন প্রজাতি এবং দুর্বল ইকোসিস্টেম রক্ষার্থে কর্মসূচি গ্রহণ, ইত্যাদি।[৬৩]

২.২.৬ বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন

২.২.৬.১ বন আইন ১৯২৭ (২০০০ সালে সংশোধিত)

বাংলাদেশের 'বন আইন ১৯২৭' প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ-ভারতের 'দি ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৯২৭' এর প্রায় হুবহু অনুবাদকৃত সংকলন।[৬৪] বাংলাদেশে বন আইনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে এবং দ্বিতীয় ও সর্বশেষ সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৯০ ও ২০০০ প্রকাশিত হয়। বন আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান (ধারা নম্বরসহ) এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

- প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেকোনো ভূমি সরকার কর্তৃক 'সংরক্ষিত বনভূমি' হিসেবে ঘোষণা (৪) (১) ও যেকোনো সংরক্ষিত বন বা তার অংশবিশেষ রিজার্ভমুক্ত ঘোষণা (২৭) (১ ও ২);

---

[৫৬] *বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬ (চূড়ান্ত খসড়া)*, বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সিআরপিএআরপি (ডিসেম্বর ২০১৬)।

[৫৭] *জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া)*, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫৮] সরকারি তথ্যমতে, দেশে ১০ শতাংশ বা এর বেশি গাছের ঘনত্ব সম্পন্ন বনায়ন ১৯.২১ শতাংশ (সূত্র: বন উপখাত, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫)।

[৫৯] বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬০] অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হলো- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।

[৬১] 'বন উপ-খাতের কৌশল ও নীতি', *৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/35rsgkI, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ নভেম্বর ২০১৯।

[৬২] প্রাগুপ্ত।

[৬৩] প্রাগুপ্ত।

[৬৪] বৃটিশ-ভারতে বন সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসি 'দি ফরেস্ট চার্টার' প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৫ সালে 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয় বনের শ্রেণীবদ্ধকরণ, বন সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বিষয় প্রাধান্য পায়। পরবর্তীতে 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৮৭৮' এর অধীনে ভারতীয় উপমহাদেশের মোট ভূমির এক পঞ্চমাংশ জাতীয়করণ করাসহ বন সংরক্ষণসহ বন উজাড় ও ক্ষতিসাধনকে প্রথমবারের মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আইনে সরকারি বন বিভাগের ওপর বন ও বনভূমি কেন্দ্রিক সকল কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ইতোপূর্বেকার আইনটির হালনাগাদ ও পরিমার্জিত সংস্করণ হলো 'দি ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৯২৭' যাতে কাঠ ও অন্যান্য বনজ উৎপাদন, ট্রানজিট ও বন সংক্রান্ত কর আরোপের বিষয় সংযোজন করা হয়।

- সরকারি বনের জমিতে সামাজিক বনায়ন ও সুবিধাভোগীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও এসব জমি দেখভাল করার দায়িত্ব অর্পণ (২৮ এ) (১);
- যেকোনো বনভূমি ও পতিত জমি ('ওয়েস্ট ল্যান্ড') রক্ষিত বন (প্রোটেক্টেট ফরেস্ট) হিসেবে ঘোষণা (২৯) (১ ও ২));
- রক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে গাছ ও বনজদ্রব্য পরিবহনের জন্য রক্ষিত বন সংলগ্ন গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের পারমিট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা (৩২ বি);
- দেশের যেকোনো স্থানে উৎপাদিত বা বিদেশ হতে আনিত বনজদ্রব্যের ওপর করারোপ (৩৯);
- দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে থেকে আনীত বনজদ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা প্রণয়ন (৪১) (১);
- মালিকানা দাবিদারহীন বনজদ্রব্য রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণ (৪৮);
- বন কর্মকর্তা কর্তৃক অবৈধ বনজদ্রব্য আটক করার ক্ষমতা (৫২);
- ইচ্ছাকৃত ও হয়রানীমূলকভাবে বনজদ্রব্য আটকের দায়ে সংশ্লিষ্ট বন বা পুলিশ কর্মকর্তার জন্য শাস্তি (৬২);
- অ-জামিনযোগ্য অপরাধ (৬৩)(এ): বন কর্মকর্তা দ্বারা চিহ্নযুক্ত কোনো গাছ কাটা বা উপড়ে ফেলা (২৬) (১)(এ), সংরক্ষিত বনের কোনো গাছ বা গাছের চারা কাটা, উপড়ানো, আগুন দ্বারা পোড়ানো (৩৩) (১) (এ);
- বন অপরাধ সন্দেহে বন ও পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে আটক করার ক্ষমতা (৬৪) (১);
- বন অপরাধ বিচার করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে 'বন ম্যাজিস্টেট' হিসেবে নিয়োগ (৬৭) (এ);
- বন মামলা পরিচালনার দায়িত্বভার ডেপুটি রেঞ্জারের নিচে নয় এমন বন কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্তকরণ (৬৯ এ);[৬৫]
- বন কর্মকর্তাদের বিশেষ ক্ষমতা, যেমন- দেশের যেকোনো এলাকার জমিতে জরিপ, সীমানা চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্র তৈরির উদ্দেশ্যে অবাধে প্রবেশাধিকার (৭২) (এ), তল্লাশির হুকুমনামা ইস্যু (৭২) (সি), বন অপরাধ তদন্ত ও আলামত সংগ্রহের ক্ষমতা (৭২) (ডি), ইত্যাদি।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বন আইনে বন বিভাগকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবে দক্ষতা, সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্যকরভাবে ও নির্ভয়ে আইন প্রয়োগ করা গেলে সরকারি বন ও বনজসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং এর দ্বারা বনখাতে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে অভিমত রয়েছে।[৬৬]

২.২.৬.২ 'দ্যা প্রাইভেট ফরেস্টস অর্ডিনেন্স, ১৯৫৯'[৬৭]

ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বন ও বনায়ন কার্যক্রম 'দ্যা প্রাইভেট ফরেস্টস অর্ডিনেন্স, ১৯৫৯' (১৯৫৯ সালের ৩৪ নম্বর অধ্যাদেশ) এর মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়। এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো- সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি বন ঘোষণা; বন মালিক কর্তৃক বনায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার বন কর্মকর্তার কাছ থেকে তা অনুমোদন; ইজারা প্রদানের পর বন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেখে পুনরায় ইজারা প্রদান ও ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধিতে নিষেধাজ্ঞা; অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কোনো শর্ত বা শর্তাদি কার্যকর করতে ব্যর্থতা বা অবহেলার জন্য বন মালিককে দোষী সাব্যস্ত করা; প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন বন সংলগ্ন জমি ও পতিত জমির বনায়ন; অর্পিত বনকে এস্টেট হিসেবে ঘোষণা এবং প্রজ্ঞাপিত বেসরকারি বনে শুল্ক আরোপ; বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্তৃক বনজ দ্রব্য ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিবহনযান আটক; মালিকানাবিহীন জব্দকৃত বনজদ্রব্য বাজেয়াপ্তকরণ ও তা ডিসপোজ করা; বন কর্মকর্তা কর্তৃক বন অপরাধ সংঘটনের সন্দেহে যেকাউকে আটক ও মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া ক্ষমতা; ইত্যাদি।

২.২.৬.৩ 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩'[৬৮]

---

[৬৫] "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government may empower any Forest-officer not inferior to that of a Deputy Ranger to appear, plead and conduct the prosecution on behalf of the Government before any Court in any case where a forest-offence is under trial, Prosecution of forest-offences." তথ্যসূত্র: Prosecution of forest-offences, 69A, বন আইন ১৯২৭ (২০০০ সালে সংশোধিত)।

[৬৬] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকদের একাংশ; দু'জন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা; সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, সহকারী বন সংরক্ষক, ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, বন মামলা পরিচালকদের একাংশ।

[৬৭] 'দ্যা প্রাইভেট ফরেস্টস অর্ডিনেন্স ১৯৫৯', ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিনেন্স নম্বর ৩৪ (মে ১১, ১৯৫৯), বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2QMvQkf, সর্বশেষ ভিজিট: ২২ নভেম্বর ২০১৯।

[৬৮] *'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩'*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (নভেম্বর ২০, ২০১৩), বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ নভেম্বর ২০১৯।

এই আইনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো হলো- লাইসেন্স ছাড়া ইট প্রস্তুত; 'ইট ভাটা'য় কৃষিজমি, পাহাড় ও টিলার মাটি ব্যবহার; ইট পোড়াতে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার; পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে দুই কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত; সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, কৃষি জমি, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর ইত্যাদি এলাকায় ইটভাটা স্থাপন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৬৯] এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে নিষিদ্ধ এলাকায় ইটভাটা স্থাপনের দায়ে আদালত কর্তৃক অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[৭০]

২.২.৬.৪ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২'[৭১]

বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এসবের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, পাচার ও ক্রয়-বিক্রয় আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করেছে।[৭২] ১৯৭৩ সালে দেশে প্রথম বারের মতো বন্যপ্রাণী সুরক্ষা বিষয়ক বিধান তথা 'বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ (প্রিজারভেশন) অর্ডার ১৯৭৩' প্রণয়ন করা হয় এবং এর পরের পছর তা 'আইনে'[৭৩] পরিণত হয়। ২০১২ সালে উক্ত আইনটির সর্বশেষ সংশোধন ও হালনাগাদ করে 'বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২' হিসেবে নামকরণ করা হয়।[৭৪] এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো- জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উপদেষ্টা বোর্ড ও বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন ও দায়িত্ব অর্পণ; বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও মহা-বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রজাতি নির্ধারণ ও তা সংরক্ষণ; বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা; বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ; অভয়ারণ্য ঘোষণা ও এতে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন; জাতীয় উদ্যান ঘোষণা; আবদ্ধ প্রাণী ও বন্যপ্রাণীর লাইসেন্স প্রদান, বাতিল ও স্থগিতকরণ; অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন; অবৈধভাবে দখলে রাখা বা মৃত বন্যপ্রাণী ও এর দেহের অংশ বিশেষ জব্দকরণ, ইত্যাদি। এই আইন লঙ্ঘনের দায়ে সর্বোচ্চ ১২ বছরের কারাদণ্ড ও অনধিক ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে (ধারা ৩৫)।

২.২.৭ বিধিমালা

২.২.৭.১ 'রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭'[৭৫]

'রক্ষিত বনের'[৭৬] উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠির জন্য রক্ষিত এলাকায় বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, বনজ সম্পদ হতে প্রাপ্ত আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও তা বণ্টন, সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, এবং বনকর্মীদের সাথে বন-নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়। এই বিধি দ্বারা বন অধিদপ্তরকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, যেমন- অংশীজনের সাথে পরামর্শ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, রক্ষিত এলাকা ও সংলগ্ন এলাকায় এক বা একাধিক কোর জোন, বাফার জোন, করিডোর, ল্যান্ডস্কেপ নির্ধারণ করে এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও মানচিত্র প্রণয়ণ, জরিপ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা,

---

[৬৯] কতিপয় স্থানে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, ধারা ৮ (২) এর খ, 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১৩ নভেম্বর ২০১৯।

[৭০] আইনের ধারা ১৮, *ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১৩ নভেম্বর ২০১৯।

[৭১] *বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (জুলাই ১০, ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102.html?lang=bn, সর্বশেষ ভিজিট: ১ ডিসেম্বর ২০১৯।

[৭২] ১৯৮১ সালে বিপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষায় ওয়াশিংটন ডিসিতে Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) সরকারগুলোর মধ্যে সাক্ষরিত একটি আর্ন্তজাতিক চুক্তি। এর লক্ষ্য বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য যেন কোনো প্রকার হুমকি হিসেবে দেখা না দেয় তা নিশ্চিত করা। এই আর্ন্তজাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ বা সংস্থা (যাদেরকে পার্টি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে) তাদের দেশ/প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী করে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করবে এবং বিপন্ন প্রজাতিকে রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে। CITES এ মোট ১৮১টি পার্টি অনুসাক্ষর করেছে, এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সর্বশেষ পার্টি। এ আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বন্যপ্রাণী ও বিপন্ন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। বিস্তারিত দেখুন: https://www.cites.org/eng/disc/what.php, সর্বশেষ ভিজিট: ২ ডিসেম্বর ২০১৯।

[৭৩] বাংলাদেশ ওয়াল্ডলাইফ (প্রিজারভেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৭৪, বিস্তারিত দেখুন: ---------------------------------

[৭৪] উল্লেখ্য, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ইতোপূর্বেকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইন হলো- *এলিফ্যান্ট প্রিজারভেশন এ্যাক্ট ১৮৭৯; দি ওয়াইল্ড বার্ড অ্যান্ড এ্যানিমেলস প্রটেকশন অ্যাক্ট ১৯১২; দি বেঙ্গল রাইনোসিরাস প্রিভেনশন অ্যাক্ট ১৯৩২; দি প্রোটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৫০; দি প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৬৪*।

[৭৫] *রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০১৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (১২ নভেম্বর ২০১৭), বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

[৭৬] সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ও বন রক্ষিত বনের আওতাভুক্ত। এ ধরনের বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতিত সকল ধরনের কার্যক্রম করা সম্ভব, বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

ইত্যাদি।[৭৭] এছাড়া 'সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য কমিটি গঠন প্রক্রিয়া, কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ, পিপলস্ ফোরাম গঠন ও কার্যাবলী নির্ধারণ, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম গঠন ও ফোরামের দায়িত্ব নির্ধারণ, কমিউনিটি টহল দল গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ, উপকারভোগী নির্বাচন ও আয় বণ্টনের বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

২.২.৭.২ 'করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২'[৭৮]

এই বিধিমালা দ্বারা পৌর এলাকা ব্যতিত যেকোনো সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত বা অন্য কোনো ধরনের সরকারি বনভূমির সীমানা হতে দশ কিলোমিটারের মধ্যে করাতকল স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে (বিধি ৭, উপ-বিধি ক)। এছাড়া সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন পার্ক, উদ্যান এবং জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে এইরূপ কোনো স্থানের ন্যূনতম ২০০ মিটার এর মধ্যেও করাত-কল স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত এলাকা বাদে কোনো এলাকায় আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করাত-কলের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের লক্ষ্যে আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করবে (বিধি ৩ এর উপ-বিধি ২-৬)। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী বন সংরক্ষক সদস্য সচিব হিসেবে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন (বিধি ৩ এর উপ-বিধি ৪৬)। এই বিধিমালা অনুযায়ী কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং চিরাই এর হিসাব করাত-কল মালিকগণ বন অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফরমে (ফরম ঘ- 'কাঠ ক্রয়-বিক্রয় এবং চিরাই এর মাসিক হিসাব') সংরক্ষণ করবেন এবং নিকটস্থ বন বিভাগীয় দপ্তরে মাসিক ভিত্তিতে দাখিল করবেন (বিধি ৯) এবং পরিদর্শনকালীন সময়ে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে প্রদর্শন করতে হবে। এই বিধিমালায় অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় দণ্ডিত করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে (বিধি ১০)।

২.২.৭.৩ 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪'[৭৯]

বন অধিদপ্তর 'সামাজিক বনায়ন'[৮০] ১৯৮০-৮১ সালে শুরু করলেও ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো 'বন আইন ১৯২৭ (২০০০ সালের সংশোধিত)' সংশোধন করে 'সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম" অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা আইনি কাঠামোতে আনা হয়। এরপর ২০০৪ সালে প্রথমবারের মতো 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০০' প্রবর্তন করা এবং ২০১০ ও ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধিত বিধিমালায় সামাজিক বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।[৮১] সামাজিক বনায়ন বিধিমালায় (২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত) অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ হলো- বন অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বন ও জমির অংশবিশেষ সামাজিক বনায়নের নির্ধারণ ও সীমানা চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা; সুবিধাভোগীর (ব্যক্তি/বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান) সাথে সামাজিক বনায়ন চুক্তিস্বাক্ষর; চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক চুক্তির মেয়াদান্তে নবায়ন; সামাজিক বনায়নের আবেদন সংগ্রহ, যাচাই ও অনুমোদন; 'উপকারভোগী'[৮২] নির্বাচন ও দায়িত্ব হস্তান্তর; ব্যবস্থাপনা ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন; বনের আবর্তকাল নির্ধারণ; বন অধিদপ্তরসহ চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ; বনায়ন হতে লব্ধ আয় বণ্টন; বিরোধ মীমাংসার প্রক্রিয়া, ইত্যাদি।

---

[৭৭] ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (বিধি ২০), *রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০১৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (১২ নভেম্বর ২০১৭), বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

[৭৮] *করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা*, ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (মে ২৭, ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/7a968b69-7b0f-4c58-8530-970040ac659a/Saw-mill-(Licence)-Rule-2012, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[৭৯] *সামাজিক বনায়ন বিধিমালা*, ২০০৪ (মে ২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত), বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/0c05d1d9_54b2_4b0c_91d3_b1008b50c591/Social%20Forestry%20Rules%202004.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[৮০] সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন গড়ে তোলা বা বন সৃষ্টি করাকে সামাজিক বনায়ন বলে। এই কার্যক্রম স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। এই বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী ও আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণ করা। ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর সাটি জেলায় 'কমিউনিটি ফরেস্ট্রি' প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন প্রচলন করে। বন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে এ যাবৎ প্রায় ৭৯ হাজার ২৯৮ হেক্টর উডলট বাগান, ১০ হাজার ৬২৬ হেক্টর কৃষি বন বাগান, ৬৬ হাজার ৪৭২ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের তথ্য পাওয়া যায়। এসব বাগানে প্রায় ছয় লক্ষ ২৭ হাজার উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। তথ্যসূত্র: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ইউএসএইড'র ক্লাইমেট- রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এণ্ড লাইভলিহুডস (ক্রেল) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৪,), পৃষ্ঠা ১৭৮, এবং বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/665d37e7-ce3a-4117-af13-f8147d448e98/-, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯)।

[৮১] এই বনায়ন প্রকিয়ায় বনায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, বনজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, লভ্যাংশ বণ্টন ও পুনবনায়ন কাজে উপকারভোগীরা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকার বিষটি সংশোধনীতে আনা হয়।

[৮২] উপকারভোগী হওয়ার শর্তাবলীগুলো হলো: ভূমিহীন, ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক, দুস্থ মহিলা, অনগ্রসর গোষ্ঠী, দরিদ্র আদিবাসী, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/0c05d1d9_54b2_4b0c_91d3_b1008b50c591/Social%20Forestry%20Rules%202004.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯)।

২.২.৭.৪ 'বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১'[৮৩]

এই বিধিমালাটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় থাকা বন ব্যতিত সুন্দরবন সহ দেশের সকল এলাকার সংরক্ষিত বনের জন্য প্রযোজ্য। বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ হলো- বনজদ্রব্য পরিবহনে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য পথের নিয়ন্ত্রণ; সংরক্ষিত বনভূমি, রক্ষিত বনভূমি, অর্জিত বনভূমি (একোয়ার্ড ফরেস্ট), অর্পিত বনভূমি (ভেস্টেড ফরেস্ট), সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি এবং অন্যান্য সরকারি মালিকাধীন ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ; সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ, সংযোগ সড়ক, ইত্যাদি ভূমি হতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন; বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমি হতে বনজদ্রব্য আহরণ ও পরিবহন; চা বাগানের ভূমি হইতে বনজদ্রব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন; সড়ক রেলপথ, জলপথ, আকাশপথ বা অন্যান্য পথে বনজদ্রব্য পরিবহন; আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রেরিত বনজদ্রব্য পরিবহন; বনজদ্রব্য মজুদ রাখবার জন্য ডিপো নিবন্ধিকরণ; ভিনিয়ার ফ্যাক্টরি, ফার্নিচার মার্ট বা টিম্বার প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন; বিধান লংঘনের দায়ে দণ্ড[৮৪]; অপরাধ প্রবণতা রোধের জন্য পুরস্কার[৮৫], ইত্যাদি।

২.২.৭.৫ বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৯[৮৬]

বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ও গুরুতর আহত ব্যক্তির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২' এর ৫২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই বিধি প্রণয়ন করা হয়। এতে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক বা রেঞ্জ কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গঠিত কমিটি আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষতিপুরণ মঞ্জুর ও আপিল করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

২.২.৭.৬ বাংলাদেশ বায়ো সেফটি রুলস, ২০১২[৮৭]

'দি বেঙ্গল প্রাইভেট ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৯৪৫' এ ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচালিত যেকোনো বন, অনুপযুক্তভাবে পরিচালিত, বনায়ন ও তিন বছরের অধিক সময় পতিত থাকলে যেকোনো বনভূমিকে সরকার এই আইনের অধীনে অধিভুক্ত করতে পারবে। 'দি ইস্ট বেঙ্গল স্টেট এ্যাকুইজিশন এন্ড টেনানন্সি এ্যাক্ট ১৯৫০' এর ৭৬ এর ১ উপ-ধারা অনুযায়ী কোনো ভূমি যদি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় এবং তা যদি সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাহলে সরকার এই ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারেন অথবা ব্যবহার করতে পারেন।

২.২.৮ বন সংশ্লিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকল

২.২.৮.১ প্যারিস এগ্রিমেন্ট[৮৮]

বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তি ('প্যারিস এগ্রিমেন্ট') অনুস্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি মোতাবেক বিশ্বব্যাপি বন সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও টেকসই ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা দ্বারা বনসহ গ্রীণহাউজ গ্যাসের আধারসমূহকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৮৯] এছাড়া চুক্তির অধীনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যে সম্মতি সম্পর্কিত নির্দেশিকা ও সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে ফলাফল-ভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পাশাপাশি উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন- বন উজাড় ও বন অবক্ষয় (ফরেস্ট

---

[৮৩] *বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (৭ মে ২০১১), বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/5b0d6820-0888-489c-b762-f8772bc5900f/Forest-produce-transit-(control)-rules-2011, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[৮৪] এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘনের দায়ে ....অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, যানবাহন, জলযান, ট্রাক, লরি ও পশুসহ সংশ্লিষ্ট বনজদ্রব্য সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা যাবে। [তথ্যসূত্র: বিধি ১৪, *বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (৭ মে ২০১১), বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/5b0d6820-0888-489c-b762-f8772bc5900f/Forest-produce-transit-(control)-rules-2011, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯]

[৮৫] 'বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কোন বন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সংবাদদাতা এবং অপরাধ উদ্‌ঘাটনকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জব্দকৃত বনজদ্রব্য বিক্রয়লব্দ অর্থ বা আদায়কৃত জরিমানার অর্থ হতে সর্বোচ্চ শতকরা দশ টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন,' তথ্যসূত্র: প্রাগুপ্ত, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/5b0d6820-0888-489c-b762-f8772bc5900f/Forest-produce-transit-(control)-rules-2011, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[৮৬] বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধিমালা ২০১৯ (খসড়া), বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2Fq5pLM, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[৮৭] Bangladesh Biosafety Rules 2012, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Gazette, Additional Copy (২ সেপ্টেম্বর ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://bangladeshbiosafety.org/wp-content/uploads/2017/04/Bangladesh_Biosafety_Rules_2012.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[৮৮] জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর আওতায় ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (21st Conference of the Parties or COP21) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কনভেনশনভুক্ত ১৯৫টি রাষ্ট্রের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ইউএনএফসিসিসি-এর আওতায় একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়, যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি বা প্যারিস এগ্রিমেন্ট নামে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের দিনে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তা অনুমোদন ও ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর তা কার্যকর করা হয়।

[৮৯] অনুচ্ছেদ ৫ (১), *প্যারিস এগ্রিমেন্ট*, ইউনাইটেড নেশন্স ২০১৫, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/37lR3bn

ডিগ্রেডেশন) থেকে নির্গমন হ্রাস সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা ও নীতিগত পন্থা; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বন সংরক্ষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও বন সম্প্রসারণ দ্বারা কার্বন আধার (কার্বন স্টক) বৃদ্ধি; বিকল্প নীতি পদ্ধতি, যেমন- অবিচ্ছেদ্য ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশমন ও অভিযোজন পদ্ধতির যথোপযুক্ত, কার্বনবিহীন সুবিধাকে উৎসাহিত ও প্রনোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি।[৯০]

২.২.৮.২ রামসার কনেভেনশন[৯১]

এটি বিশ্বব্যাপী জৈবপরিবেশ রক্ষার একটি সম্মিলিত প্রয়াস। বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ পৃথিবীর ১ হাজার ৮২৮টি জলাভূমি (ওয়েটল্যান্ড) আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে রামসার তালিকায় স্থান পেয়েছে।[৯২]এই কনভেশনটি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। সনদে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র রামসার তালিকাভুক্ত জলাভূমির সীমানা সুনির্দিষ্টকরণ ও মানচিত্র তৈরি করার পাশাপাশি নদী ও সাগরের তীরবর্তী এলাকা জলাভূমির সাথে একত্রীকরণ, জলাভূমি সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ছয় মিটারের অনধিক গভীর সামুদ্রিক উপকূলীয় জলের অংশ বিশেষ যার জলজ আবাস্থল হিসেবে গুরুত্ব রয়েছে ইত্যাদি স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৯৩] এছাড়া সদস্য দেশগুলো স্থানীয়, এলাকাভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত জলাভূমি ও এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যাতে বিশ্বব্যাপি টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। জরুরি জাতীয় প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ও সীমানাচিহ্নিত জলাভূমি ও সম্পদ বিনষ্ট করা হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে একই স্থানে কিংবা অন্যত্র একই প্রকার জলজপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের অতিরিক্ত প্রাকৃতিক আবাসস্থল সৃষ্টি করা বিষয়ে সদস্য রাষ্টসমূহ ঐকমত্য হয়।[৯৪]

২.২.৮.৩ কিয়োটো প্রোটোকল

এটি একটি বহুরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি। এতে স্বাক্ষরকারী ১৯২টি দেশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য দায়বদ্ধ। ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে এই চুক্তি প্রথম গৃহীত হয় এবং ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তা কার্যকর হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলতে পারার মতো বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাইস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'দ্যা ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' সভায় গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে পূরণের বলা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে প্রথম দায়বদ্ধতা সময়কালে ৩৭টি শিল্পোন্নত দেশের কার্বন নিসরণের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়। ২০১২ সালে কাতারের রাজধানী দোহায় এই চুক্তিকে পরিবর্ধিত করেছে পেশ করা হয়, যা দোহা সংশোধনী নামে পরিচিত। এই সংশোধনী অনুসারে শুধু ২০২০ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলোকে কার্বন নিসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে কিয়োটো পরবর্তী একটি আইনি কাঠামো তৈরির চেষ্টা চলছে, যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিস শহরে পেশ করা হয়। বাংলাদেশ ২০০১ সালের ২২ অক্টোবর চুক্তিটি অনুস্বাক্ষর করেছে এবং ২০১৩ সালের ১৩ নভেম্বর চুক্তিটি কার্যকর করে। তবে এখন পর্যন্ত এ চুক্তির দ্বিতীয় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি।

২.২.৮.৪ 'কনভেনশন কনসার্রিং দি প্রটেকশন অব দি ওয়ার্ল্ড কালচারাল এন্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ'[৯৫]

উক্ত সনদ মোতাবেক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সনাক্তকরণ, সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উপস্থাপনা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত আইনি, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৯৬] এরই অংশ হিসেবে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বের ২১টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে চার বছরের জন্য নির্বাচিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যগুলিকে সংরক্ষণ, রক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য তালিকা হালনাগাদ করণসহ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ফান্ড থেকে অর্থায়ন করে। উল্লেখ্য, হেরিটেজ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি বছরই নতুন নতুন ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত হয়, আর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ঘোষিত ঐতিহ্যস্থল তালিকা থেকে বাদ পড়ে। সনদে স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ জাতীয় ও আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা ও উপস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎসাহিত করার জন্য

---

[৯০] অনুচ্ছেদ ৫ (২), *প্যারিস এগ্রিমেন্ট*, ইউনাইটেড নেশন্স ২০১৫।

[৯১] Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance especially as waterfowl Habitat).

[৯২] ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 'কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ড' নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে এতে মোট ১৫৮টি দেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে রামসার কনভেশন সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ১৯৯২ সালের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ রামসার চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের টাঙ্গুয়ার হাওড় ও হাকালুকি হাওরও রামসার তালিকায় স্থান পেয়েছে।

[93] অনুচ্ছেদ ২ (১), *কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস অব ইন্টারন্যাশনাল ইমপোরটেন্স স্পেশালি এট ওয়াটারফউল হেবিটেট*, রামসার, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, প্রত্যায়িত অনুলিপি, ইউনেস্কো, প্যারিস (জুলাই ১৯৯৪), বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2F6ikm5.

[৯৪] অনুচ্ছেদ ৪ (২), প্রাগুপ্ত।

[৯৫] বিস্তারিত দেখুন: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

[৯৬] অনুচ্ছেদ ৫ (১), বিস্তারিত দেখুন: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৯৭] বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালের ৩ আগস্ট চুক্তিটি গ্রহণ করেছে এবং একই বছরের ৩ নভেম্বর চুক্তিটি অনুমোদন করে। বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ এই কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ।[৯৮]

২.২.৮.৫ কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে জৈব বৈচিত্র্যের ওপর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়গুলো রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মোট ১৬৮টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯২ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ থেকে তা কার্যকর করে।

২.২.৮.৬ ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন টু কমবেট ডেজার্টিফিকেশন

তীব্র খরা ও মরুকরণের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী দেশগুলোতে বিশেষ করে আফ্রিকায় খরা হ্রাস ও মরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জাতিসংঘ ১৯৯৪ সালে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলো তীব্র খরা ও মরুকরণের হাত থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ ইউএনসিসিডি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৬ সালের ২৬ জানুয়ারি তা অনুমোদন করে।

২.২.৮.৭ কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেনজার্ড স্পেসিস

কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড স্পেসিস (সিআইটিইএস) একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে বিপন্ন প্রজাতির গাছ ও প্রাণী রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও গাছের বিলুপ্তির হুমকি তৈরি না করে। ১৯৮১ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৮২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তা অনুমোদন করেছে।

২.৩ বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.৩.১ সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৪৭ সালে বৃটিশ-ভারত বিভক্তির পূর্বে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বাংলা ও আসাম বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বন অধিদপ্তরের আওতায় ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস এবং সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়।[৯৯] মূলত সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার রুল প্রবর্তন ও বিসিএস (বন) ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্ব এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করার পাশাপাশি বন অধিদপ্তরকে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে এই মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়') অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সর্বশেষ পুনর্গঠন করা হয় ১৯৯৯ সালে।[১০০] কাজের ধরন ও দায়িত্ব অনুসারে বন অধিদপ্তরের মোট চারটি পৃথক 'উইং' বা শাখা রয়েছে, যথা- ক. বন ব্যবস্থাপনা; খ. সামাজিক বনায়ন; গ. পরিকল্পনা; এবং ঘ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (চিত্র ২)।[১০১] প্রতিটি শাখা একজন ডেপুটি চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট বা উপ-প্রধান বন সংরক্ষকের অধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া সমস্ত বন বিভাগকে মোট নয়টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে।[১০২] পাঁচটি ব্যবস্থাপনা সার্কেল, তিনটি সামাজিক বনায়ন সার্কেল এবং একটি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সার্কেল। প্রতিটি সার্কেল একজন বন সংরক্ষক বা কনজারভেটর অব ফরেস্ট এর অধীনে পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ে মোট ৪৪টি বিভাগীয় বন দপ্তর রয়েছে এবং প্রতিটির দায়িত্বে রয়েছেন একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও)।[১০৩] মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য স্তরের কার্যালয়গুলো হলো- ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, চেক স্টেশন, ক্যাম্প ও ফাঁড়ি।

---

[৯৭] বিস্তারিত দেখুন: অনুচ্ছেদ ৫ (৫) https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

[৯৮] বিস্তারিত দেখুন: https://whc.unesco.org/en/list/?&type=natural.

[৯৯] The Journal of Forestry, Volume 21, The Pakistan Forest Insytitute (1971), University of Minnesota, USA, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/39Cbp1X, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১০০] সংযুক্তি ৩ দেখুন (বন অধিদপ্তরের বর্তমান অর্গানোগ্রাম)।

[১০১] বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অর্গানোগ্রাম, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/ac1b4adc-82ee-48eb-9150-ade7058a642c/-, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১০২] প্রাগুপ্ত।

[১০৩] প্রাগুপ্ত।

চিত্র ২: বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

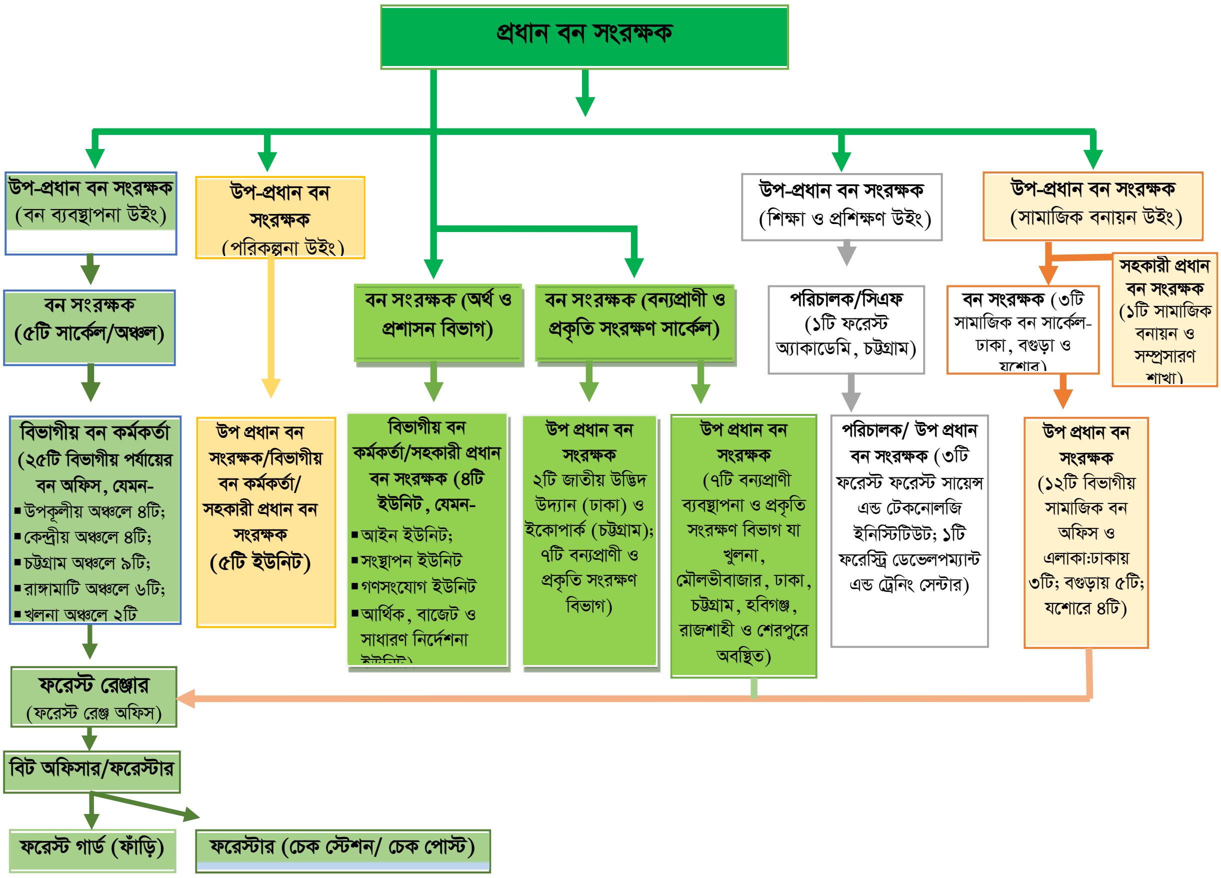

২.৩.২ বন অধিদপ্তরের ক্ষমতা ও কর্ম পরিধি[১০৪]

বন অধিদপ্তর বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো- আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।[১০৫] বন অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো- বনজসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ; সরকারি বনাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বনজসম্পদ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধানের প্রয়োগ; বনের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা; বনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন; গণমুখী বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের প্রতিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনের ভূমিকা বৃদ্ধি; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ; অবক্ষয়িত বনাঞ্চলের পুনরুদ্ধার; অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি।[১০৬]

বন অধিদপ্তরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো- সরকারি যেকোনো প্রকার জমি, যেমন- প্রান্তিক, নতুন জেগে ওঠা ভূমি, খাসভূমি এবং অশ্রেণীভূক্ত বনে দ্রুতবর্ধন ও উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির গণমুখী বনায়ন কার্যক্রমের দ্বারা বৃক্ষাচ্ছাদন সম্প্রসারণ; সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বনায়নের প্রতি কারিগরি উপদেশ ও সহায়তা প্রদান; বন ও জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলসমূহের প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা প্রদান।[১০৭]

---

[১০৪] প্রাগুপ্ত।

[১০৫] বন অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে (তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/b24cdba5-14e0-4fde-8114-b7a557038915/-, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১০৬] বন অধিদপ্তরের কার্যাবলী। তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/f130144e-978a-4931-b7d0-959dc93eecf1/-, সর্বশেষ ভিজিট: ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১০৭] প্রাগুপ্ত।

চূড়ান্ত বরাদ্দ হিসেবে প্রাপ্ত বাজেটের প্রায় ৯৬ শতাংশ আঞ্চলিক তথা মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো কর্তৃক ব্যয় করা হয়।[১০৮] অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মোট ১০টি আঞ্চলিক (সার্কেল) কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। এসব সার্কেলের অধীনে মোট ৪৪টি বিভাগীয় বন কার্যালয় রয়েছে যেগুলো মূলত মাঠ পর্যায়ের রেঞ্জ (২৫৫টি), বিট (৬৭২টি), ক্যাম্প ও চেক স্টেশনগুলোর কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করে। সদর দপ্তর কার্যত মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে ১০টি সার্কেল ও ৪৪টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরসমূহের সাথে অনেকটা সমন্বয়ক ও দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে থাকে (সংযুক্তি ৪ দেখুন)।

২.৩.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.৩.৩.১ বর্তমান জনবল কাঠামো

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বন অধিদপ্তরে অনুমোদিত ১০ হাজার ৩২৮টি পদের বিপরীতে ৬ হাজার ৮৯৪টি পদ পূরণকৃত অবস্থায় আছে। বন অধিদপ্তরের মূল দায়িত্ব বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা হওয়ায় সংস্থাটির প্রধান হতে মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বন বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী হতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজের ধরন ও চাহিদাভেদে বিশেষে কারিগরি জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

সারণি ৪: বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ ও মোট জনবল (সংক্ষেপিত)

ক্রমিক নম্বর	পদবি	বেতন গ্রেড	অনুমোদিত মোট পদ	পূরণকৃত পদ
১	প্রধান বন সংরক্ষক	১	১	১
২	উপ-প্রধান বন সংরক্ষক	৩	৪	১
৩	বন সংরক্ষক	৪	১১	৮
৪	সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক	৫	৫	৫
৫	উপ বন সংরক্ষক/বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	৫	৬৩	১২
৬	রিসার্চ অফিসার/বোটানিস্ট	৯	১২	৫
৭	সহকারী বন সংরক্ষক	৯	১৫৯	১০২
৮	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	৩৩	৬
৯	সহকারী পশু চিকিৎসক	৯	৪	১
১০	অন্যান্য কর্মকর্তা	(৬-৯)	৫০	১৯
মোট	প্রথম হতে নবম গ্রেডভুক্ত কর্মী		৩৪২	১৬০
১১	ফরেস্ট রেঞ্জার	১০	৪০৩	৭৫
১২	ওয়াল্ডলাইফ রেঞ্জার	১০	৯	০
১৩	বন্যপ্রাণী পরিদর্শক	১০	৭	৬
১৪	ডেপুটি রেঞ্জার	১৪	৪৫৪	০
১৫	ফরেস্টার	১৫	১,৩৪২	৯৭৫
১৬	বন প্রহরী	১৭	২,৪৫১	১,৮২৬
১৭	বোটম্যান	২০	১,৩১২	৮৩৭
১৮	মালি/হেডমালী	২০	১,৭৩৮	১,৪৮৬
১৯	অন্যান্য কর্মী	(১০-২০)	২,২৭০	১,৫২৯
মোট	দশম হতে বিশতম গ্রেডভুক্ত কর্মী		৯,৯৮৬	৬,৭৩৪
সর্বমোট	প্রথম হতে বিশতম গ্রেড (১৩০ ধরনের পদ)	(১-২০)	১০,৩২৮	৬,৮৯৪

তথ্যসূত্র: সংস্থাপন উইং, বন অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

২.৩.৩.২ জনবল নিয়োগ

বন অধিদপ্তরে সরাসরি, পদোন্নতি ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ হয়। 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-বন' (বিসিএস- বন)[১০৯] ক্যাডার পদের দুই-তৃতীয়াংশ পদে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) কর্তৃক আয়োজিত 'প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা'[১১০]

[১০৮] প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও নথি মোতাবেক।

[১০৯] তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি: বন) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯, ১৯৮৭), এস.আর.ও. ২৯২-এল/ ৮০/ইডি/আইসি/এস ২-৪/ ৮০-১০৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১১০] এটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সংক্ষেপে 'বিসিএস' পরীক্ষা নামে পরিচিত।

দ্বারা বাছাই ও সুপারিশের ভিত্তিতে 'সহকারী বন সংরক্ষক' (এসিএফ) পদে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করেন।[১১১] এই পদটি সরকারি নবম বেতন গ্রেডের সমতুল্য। বন ক্যাডার পদের অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ পদে বন অধিদপ্তরের ফরেস্ট রেঞ্জার/সমমান পদে কর্মরত কর্মীদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ করার বিধান রয়েছে।[১১২] এছাড়া দশম হতে দ্বাদশ বেতন গ্রেডের বনকর্মীদেরও পিএসসি'র সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের ১৩-১৬ গ্রেডের বেতনভুক্ত কর্মীদের ১০-১২ গ্রেড এবং ১০-১২ গ্রেড হতে প্রথম থেকে নবম গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও পিএসসি'র সুপারিশ প্রয়োজন হয়।[১১৩] প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর ১৭-২০ বেতন গ্রেডের বনকর্মীদের সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা সংশ্লিষ্ট সার্কেলের প্রধান অথবা বিভাগীয় বন কর্মকর্তারা চলতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তবে প্রকল্পের ধরনভেদে ক্ষেত্রে বিশেষে চাহিদা সাপেক্ষে বন অধিদপ্তরের বাইরে থেকে পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট জনবলের দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের কর্মীদেরকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সুফল প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তবে বন অধিদপ্তরের স্থানীয় কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ের বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সময়ে টেকনিক্যাল বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ দিতে হয়, যেমন - রিমোট সেন্সিং। কিন্তু এসব পদের জন্য নিয়োগ বিধিতে কোনো ধারা ছিল না। পরবর্তীতে অধিদপ্তর এসকল পদের জন্য প্রস্তাবিত নতুন নিয়োগ বিধিতে একটি ধারা সংযুক্ত করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বন অধিদপ্তর সরকারের আউটসোর্সিং নীতিমালাটি মেনে স্থানীয় পর্যায়ে আউটসোর্সিং করে থাকে।

২.৩.৩.৩ বদলি ও পদায়ন

প্রথম হতে নবম গ্রেডভুক্ত কর্মীদের (সহকারী বন সংরক্ষক ও তদুর্ধ্ব) বদলি ও পদায়ন দেওয়ার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। তবে এক্ষেত্রে সিসিএফ দপ্তর থেকে সুপারিশ চাওয়া হয়। অপরদিকে, প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর দশম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের বনকর্মীদের বদলি ও পদায়ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

২.৩.৩.৪ ঝুঁকি ভাতা

সুন্দরবন এলাকায় দায়িত্বপালনরত বনকর্মীদের জন্য (২০১৮ সালের শেষ দিকে) ঝুঁকি ভাতা চালু করা হয়েছে। তবে তা পূর্বের মূল বেতনের ২০ শতাংশ।

২.৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাইজেশন

কেন্দ্রীয় অফিসের ই-নথি ব্যবস্থা প্রারম্ভিক পর্যায়ে আছে। কেন্দ্রিয় কার্যালয় ডিজিটালাইজ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্যান্য কার্যালয়গুলোকে এই প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা আছে। এতে করে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর সাথে দ্রুত এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তবে প্রযুক্তির সহায়তায় বন পাহারা দেওয়ার জন্য 'স্মার্ট প্যাট্রোলিং' নামে একটি প্রকল্পের কাজ বন বিভাগের 'রিসোর্সেস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ('রিমস') ইউনিট বাস্তবায়ন করছে।

---

[১১১] সর্বশেষ সংশোধনী মোতাবেক বন অধিদপ্তরের জন্য পিএসসি'র সুপারিশে নিয়োগের জন্য অনুমোদিত মোট ক্যাডার পদ সংখ্যা ২০৪টি যার মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১২০টি এবং পদোন্নতি বা প্রেষণে ৮৪টি পদে নিয়োগ হয়। সূত্রঃ *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা (ডিসেম্বর ২৪, ২০১৮); এস.আর.ও. নম্বর ৩৭৮-আইন/২০১৮, *জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়*, *বিধি-৫ শাখা*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১১২] বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১, সংস্থাপন বিভাগ, মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি ০১, ১৯৮১; দ্যা বিসিএস (একজামিনেশন ফর প্রোমোশন রুলস, ১৯৮৬; এস.আর.ও. নম্বর ৬৪-ল/৯৮, এমই রেজি. ৫,- ৬১/৯৮-৫৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নোটিফিকেশন (২৭ এপ্রিল ১৯৯৮), বাংলাদেশ গেজেট (২৪ ডিসেম্বর ২০১৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১১৩] বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৯; এস.আর.ও নম্বর ৩০৮-আইন/২০১৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৩.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

২.৩.৫.১ রাজস্ব সংগ্রহ

রাজস্ব সংগ্রহ অধিদপ্তরের মূল কাজ না হলেও বন অধিদপ্তর সর্বশেষ চারটি অর্থ বছরে (২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৮-'১৯) সর্বমোট প্রায় ৩৮২ কোটি টাকার রাজস্ব সংগ্রহ করেছে।[১১৪] বনের কাঠ, গাছের চারা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় দ্বারা সর্বাধিক রাজস্ব (৬৭.০৫%) সংগ্রহ করেছে (চিত্র ২ দেখুন)। রাজস্বের অন্যান্য উৎসগুলোর মধ্যে রাজেয়াপ্তকৃত দ্রব্যাদি (৯.৬৭%), লাইসেন্স বা পারমিট ও সেবা বাবদ ফি (৭.৬৯%) ও বিবিধ অবাণিজ্যিক দ্রব্য বিক্রয় ও ইজারা (৪.১১%), ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য। সংগৃহীত রাজস্ব রেঞ্জ অফিসের মাধ্যমে ট্রেজারি চালানের দ্বারা মহা হিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় ।

চিত্র ৩: ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ সালে বন অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় (খাতওয়ারি)

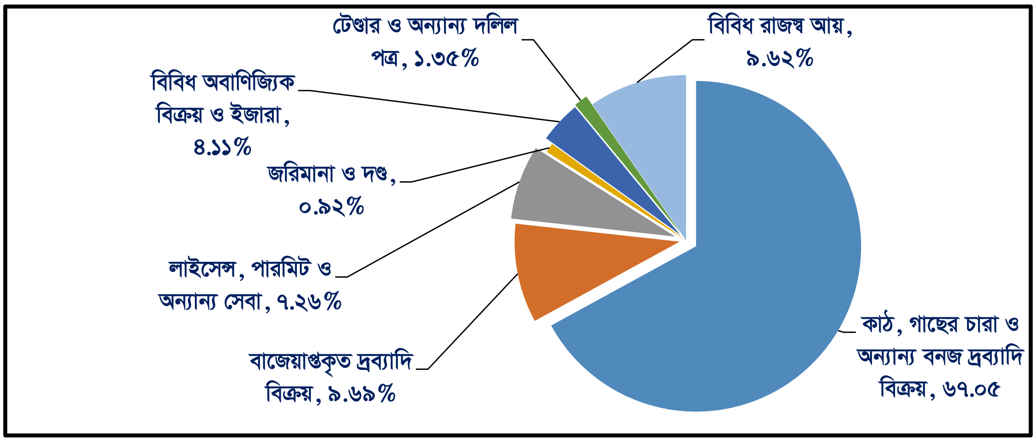

তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সাধারণত পূর্বের বছরের থেকে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত পূর্বের বছরের থেকে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হতে পারে, যেমন- আইলা এবং সিডরের পর খুলনা অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের হার কমে গিয়েছিল। তবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পারেল মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বন কার্যালয়সমূহ সম্ভাব্য কী কী কারণে তারা টার্গেট পূরণ করতে পারে নি, তা প্রধান কার্যালয়কে জানাতে হয়। আটককৃত গাছের জন্য পৃথক কোড থাকলে আরো বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা যেতো।[১১৫]

২.৩.৫.২ বাজেট বরাদ্দ ও প্রাপ্তি

বন অধিদপ্তরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পৃথক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। রাজস্ব খাতের বাজেটের অর্থ কর্মীদের বেতন-ভাতাদি, কার্যালয়ের জন্য লজিস্টিকস, ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়। অপরদিকে, উন্নয়ন বাজেটের অর্থ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন, যানবাহনের তেল, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো তৈরি, ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়। ২০১৪-'১৫ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-'১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-'১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট যেখানে ১৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ছিল, ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে তা ৩৩১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে (সারণি ৫)। অপরদিকে, ২০১৪-'১৫ অর্থ বছর থেকে উন্নয়ন বাজেট কমছে। ২০১৪-'১৫ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেট ছিল প্রায় ৩২৫ কোটি টাকা, যা ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে কমে প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা হয়েছে।

সারণি ৫: ২০১৪ - '১৫ থেকে ২০১৭ - '১৮ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	কার্যালভেদে রাজস্ব খাতে বাজেট বরাদ্দ			উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ	সর্বমোট
	সদর দপ্তর	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	মোট		
২০১৭-'১৮	১৩.৯২	৩১৭.৭৩	৩৩১.৬৫	১৭৪.০৭	৫০৫.৭২
২০১৬-'১৭	১৩.৭৫	৩১৫.২৮	৩২৯.০৩	২৫৫.০৬	৫৮৪.০৯
২০১৫-'১৬	১২.৭৪	২৪২.৭৭	২৫৫.৫১	২৯২.০৪	৫৪৭.৫৫

[১১৪] ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর মোট ৩৮১ কোটি ৮০ লক্ষ ১০ হাজার ৪৯২ টাকা বিভিন্ন খাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেটের নথি।

[১১৫] তথ্যদাতা: দু'জন ফরেস্টার, রাঙামাটি অঞ্চল।

অর্থ বছর	কার্যালভেদে রাজস্ব খাতে বাজেট বরাদ্দ			উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ	সর্বমোট
	সদর দপ্তর	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	মোট		
২০১৪-'১৫	৮.২৪	১৮৪.২০	১৯২.৪৩	৩২৪.৯৯	৫১৭.৪২

তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

মাঠ পর্যায়ের রেঞ্জ ও বিট কার্যালয় এবং ফাঁড়ি, ক্যাম্প, ইত্যাদির জন্য বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোনো পরিচালন বরাদ্দ নাই। রেঞ্জ অফিস অর্থ বছরের শুরুতে রেঞ্জ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যালয়গুলোর জন্য কী কী প্রয়োজন তার একটি তালিকা ডিএফও অফিসে জমা দেয়। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় তার অধীন অন্যান্য কার্যালয়ের কাছ থেকে বাৎসরিক চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে এবং তা সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে জমা দেয়। পরবর্তিতে সার্কেল অফিস তার অধীন সকল কার্যালয়ের চাহিদাপত্র এক করে কেন্দ্রিয় অফিসের অর্থ, বাজেট ও সাধারণ ইউনিটে পাঠায়। প্রধান কার্যালয় সকল কার্যালয়ের চাহিদাপত্র যাচাই করে অধিদপ্তরের জন্য সমন্বিতভাবে বাজেটের চাহিদা প্রস্তাব করে এবং তা বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর তা কার্যালয়গুলোতে চাহিদা অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত ডিএফও বরাবর একটি ব্যাংক হিসাবে ঐ কার্যালয়ের অধীন সকল রেঞ্জ, বিট, ফাঁড়ি, ক্যাম্প ইত্যাদির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডিএফও চাহিদা অনুযায়ী তা বিভিন্ন কার্যালয়ের মধ্যে নগদে বণ্টন করেন।

২.৩.৫.৩ বনকর্মীদের বেতন-ভাতা নগদে প্রদান

বেশিরভাগ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মীদের মাসিক বেতন-ভাতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে দেওয়া হয়। ডিএফও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ও বিট কার্যালয়ের কর্মীদের বেতন-ভাতাদির জন্য চেক ইস্যু করেন এবং তার পক্ষে একজন রেঞ্জ ও বিট কর্মকর্তা ব্যাংকে থেকে টাকা তুলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বুঝিয়ে দেন। বিট ও এর নীচের ধাপের কার্যালয়ের কর্মীদের মাসিক বেতন-ভাতাদি রেঞ্জ অফিসারের মাধ্যমে নগদ দেওয়া হয়।

২.৩.৬ ক্রয়-বিক্রয়

২.৩.৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয়

মেরামত ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরে সরকারের ক্রয় আইন ও বিধিমালা[১১৬] অনুসরণ করা হয়। অর্থবছরের শুরুতে অধিদপ্তর তাদের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়। মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়গুলোর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কাজ ডিএফও অফিস থেকে তদারকি করা হয়। তবে রেঞ্জ, বিট, ফাঁড়ি/ক্যাম্পের জন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২.৩.৬.২ বনজ দ্রব্য বিক্রয়

বনের গাছ ও কাঠ বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয় আইন/বিধিমালা[১১৭] অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রধানত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রির অপেক্ষায় থাকা বনজ দ্রব্য বিক্রি করা হয়। গাছ বিক্রির লক্ষ্যে বিট অফিস প্রথমে গাছের পরিমাণ পরিমাপ করে তা প্রতিবেদন আকারে ডিএফও কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিএফও অফিস সংগ্রহকৃত/জব্দকৃত বনজ সম্পদ বিক্রির দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নিলামে এসব বনজ সম্পদ বিক্রি করা হয়। মালিকানার দাবিদারবিহীন আটককৃত গাছ একমাস পর নিলামে তোলা হয়। তবে মালিকানা থাকলে আদালতের অনুমতি প্রাপ্তির পর তা নিলামে তোলা হয়।

২.৩.৭ বন মামলা

বন ও বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘনের দায়ে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বনকর্মীরা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) প্রজ্ঞাপন[১১৮] মূলে দেশের বিভিন্ন স্থানের বন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা-১৪ অনুযায়ী এবং উক্ত অপরাধসমূহ আমলে নেওয়ার লক্ষ্যে উক্ত কার্যবিধির ধারা-১৯০ (১)(এ)বি) এর ক্ষমতা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রথম শ্রেণীর স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানের বিধান রয়েছে। কোনো বনকর্মী একটি কর্মস্থলে দায়িত্বপালন করলেও বাদী হয়ে যে কয়টি মামলা দায়ের করেন পরবর্তীতে বদলি হলেও সংশ্লিষ্ট এলাকার আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়।

২.৩.৮ পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন

[১১৬] অনুসৃত সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালাটি হলো-Public Procurement Act 2006 এবং Public Pocurement Rules 2008, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.rhd.gov.bd/Documents/PPR/07%20-%20ThePublicProcurementAct2006(041207)45.pdf এবং http://www.btcl.com.bd/files/img/act/PPR_Public-Procurement-Rules-2008-English.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২ জানুয়ারি ২০২০।

[১১৭] প্রাগুপ্ত।

[১১৮] প্রজ্ঞাপন নম্বর সম-/জেএ-৪/৩৬/৯৩-২২৫, তারিখ: ১৭/০৪/১৯৯৪, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং এসবের সকল কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু মাঠ পর্যায়ে বন প্রকল্পের তথা সৃজিত বাগান কার্যক্রমের (যতদিন অর্থ বরাদ্দ থাকে) একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরপর জরিপের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হয়। সৃজিত বাগানের কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশাপাশি খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অবস্থিত তিনটি কার্যালয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

২.৩.৯ নিরীক্ষা কার্যক্রম

বন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম নেই। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক প্রতিবছর বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়। তবে বিভাগীয় বন কার্যালয়ের (ডিএফও) নীচের কোনো বন কার্যালয়গুলোতে সিএজি কর্তৃক কোনো নিরীক্ষা করা হয় না। কোনো ধরনের সমস্যা পেলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অডিট আপত্তি দেয়। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তারা নিরীক্ষা আপত্তির জবাব দিয়ে থাকেন।

২.৩.১০ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা

দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন ইতিবাচক প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন- ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের দু'জন কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদানের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার, যেমন- এককালীন অর্থ পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের প্রায় সকল কর্মীকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মীকে পর্যায়ক্রমিকভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত একজন উপ-প্রধান বন সংরক্ষককে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.১১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'অনুসন্ধান, অভিযোগ ও পরামর্শ' শীর্ষক পৃথক ওয়েবপেইজ রয়েছে।[১১৯] তবে মানুষ প্রয়োজনে রেঞ্জ কিংবা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে সরাসরি ফোন করে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করে। তবে নামে-বেনামে চিঠি, ই-মেইল ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন কর্মকর্তারা জনসাধারণ ও বনকর্মীদের নিকট হতে অভিযোগ পেয়ে থাকে।[১২০] তবে অভিযোগদাতারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে।[১২১] সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত। অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

২.৩.১২ বন অধিদপ্তরের অংশীজন

বন অধিদপ্তরের অংশীজনদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাও অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের অংশীজনদেরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অংশীজন, স্থানীয় বেসরকারি সহযোগি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

- নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রিয়/জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী অংশীজন হলো- জাতীয় পরিবেশ কমিটি, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

- স্থানীয় বেসরকারি সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সামাজিক, কমিউনিটি বা বসতভিটার বনায়নে জড়িত। এদের মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা (মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র), কারিতাস, আরডিআরএস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, সিসিডিবি, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা অন্যতম।

- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বন অধিদপ্তরকে বন সুরক্ষা ও সংরক্ষণে কারিগরি সহায়তা দেওয়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) অন্যতম। এছাড়াও বাংলাদেশের বন, পরিবেশ ও প্রাণসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কৌশল বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন, নরওয়ের উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (নোরাড), ইউএসএআইডি, জিআইজেড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, গ্লোবাল এনভারনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি।

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি: ইউএন-রেড (UN-REDD) বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি।[১২২]

---

[১১৯] বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/TUY05.

[১২০] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, ঢাকা বন বিভাগ।

[১২১] তথ্যদাতা: একজন ডিসিএফ, খুলনা অঞ্চল।

[১২২] বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/8b1f3a13-72b4-4639-b43e-bbd59a2bc2e0/-, সর্বশেষ ভিজিট-২৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

- বন সংশ্লিষ্ট সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ইউনিট: (১) বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি); (২) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এফআরআই); এবং (৩) ইনস্টিটিউট ফর ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স।

চিত্র ৪: বন অধিদপ্তরের অংশীজন

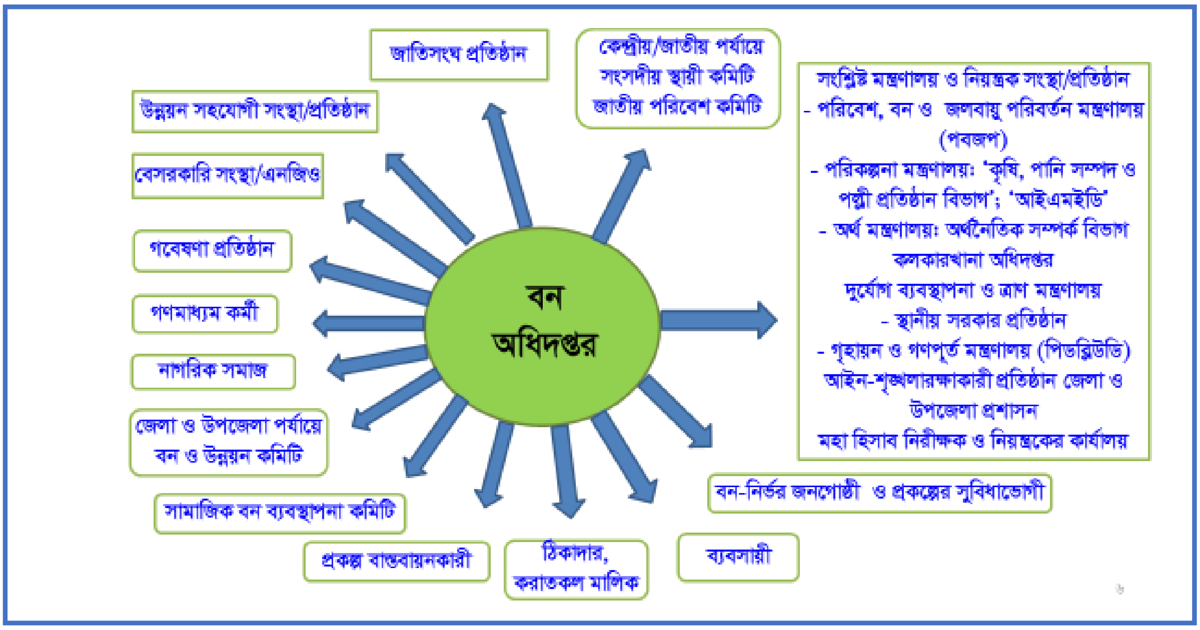

২.৩.১৩ বন অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ ও অর্জন

- উপকূলীয় বনায়ন: উপকূলীয় বনায়ন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্জন বলে বন অধিদপ্তর মনে করে। বন বিভাগ ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর চরাঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় বন প্রতিষ্ঠা করেছে, যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম। উপকূলীয় বনায়নের ফলে বিস্তৃত এলাকা চাষাবাদ ও বসবাস উপযোগী হয়েছে। উপকূলের এই সবুজ বেষ্টনী প্রত্যক্ষভাবে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করছে। এর জীববৈচিত্র্যগত ও ভৌগোলিক গুরুত্ব রয়েছে।

- সামাজিক বনায়ন: সামাজিক বনায়নকে বন অধিদপ্তরের সাফল্য হিসেবে ধরা হয়, যদিও সামাজিক বনায়নের ফলে প্রকৃত বন ধ্বংস এবং অনুপোযোগী বা ক্ষতিকর গাছ লাগানোর কারণে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে (২০১২ সালে সংশোধিত) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে আনা হয়। সামাজিক বনায়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে একটি স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রবর্তন করা হয়। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের অধীনে ১৯৮১-'৮২ সাল থেকে ২০১৭-'১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৪ হাজার ৯৩৯ হেক্টর এবং ৭১ হাজার ৪৫৬ কিলোমিটার সড়ক, বাঁধ ও রেল লাইনে গাছ লাগানো হয়।[১২৩] এই কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০১ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১৮.৯ শতাংশ নারী উপকারভোগী। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম থেকে উৎপাদিত কাঠ বিক্রি করে এ পর্যন্ত এক হাজার ৭১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৫ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ৩৫৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫২২ টাকা উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[১২৪]

- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম: বনাঞ্চলের রক্ষিত এলাকাসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি/কার্যক্রম চালু করা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে যাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ চুরির অভিযোগ ছিল এমন ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে রক্ষিত এলাকার বনজ সম্পদ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় দেশের ১৭টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- পরিযায়ী পাখি (অন্যদেশ হতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের আসা পাখি) শিকার বন্ধ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা: ২০০০ সালের পূর্বে পরিযায়ী পাখি প্রকাশ্যে ও যত্রতত্র শিকার ও বিক্রি হতো। পরবর্তিতে সরকার বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনে পরিযায়ী পাখি হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন করার কারণে পরিযায়ী পাখি আটক, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করায় পরিযায়ী পাখি হত্যা প্রায় শুন্যের কোটায় নিয়ে এসেছে। দেশের প্রায় ৫০টি এলাকা পাখির অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- বনকর্মীদের জন্য প্রণোদনা: সরকারের শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়নে কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা চালু করা হয়েছে। প্রতিটি কার্যালয়ে প্রতিবছর একজনকে তার বার্ষিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বেস্ট পারফরমার হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই ধরনের নির্দেশনা শুদ্ধাচার

[১২৩] তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তর হতে নথি পর্যালোচনা প্রাপ্ত।

[১২৪] প্রাগুপ্ত।

বাস্তবায়ন নীতিমালায় রয়েছে। বন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রতিটি অফিসে এই ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে এককালীন কোনো অর্থ পুরস্কার এবং একটি সনদ প্রদান করা হয়।

- বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক পুরস্কার প্রাপ্তি[১২৫]: বন ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে বন অধিদপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আর্ন্তজাতিক পুরস্কার পেয়েছে। এগুলো হলো-
  - ইকুয়েটর পুরস্কার ২০১২: চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি জাতিসংঘ ঘোষিত ইকুয়েটর পুরস্কার ২০১২ অর্জন।
  - ওয়াঙ্গারি মাথাই পুরস্কার ২০১২: কক্সবাজার জেলার টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও অবৈধ গাছ পাচার বন্ধে স্থানীয় জনগণ তথা নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য টেকনাফ উপজেলার কেরানতলী গ্রামের বিধবা নারী খুরশিদা বেগম আন্তর্জাতিক এ পুরস্কার অর্জন করে।
  - আর্থ কেয়ার পুরস্কার ২০১২: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত 'কমিউনিটি বেজড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ' প্রকল্পের অধীনে বনায়নের সাথে যৌথভাবে মৎস্য ও ফল চাষ পদ্ধতির আন্তর্জাতিক 'আর্থ কেয়ার' পুরস্কার অর্জন।
  - জাতিসংঘের শ্রেষ্ঠ প্রকল্প ২০১২: উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত 'কমিউনিটি বেজড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ' প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি প্রক্রিয়া জাতিসংঘের শ্রেষ্ঠ প্রকল্পের স্বীকৃতি অর্জন।

[১২৫] বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/396e299b-e059-4906-88f0-beb2c00338cc/-, সর্বশেষ ভিজিট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

তৃতীয় অধ্যায়:
বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়গুলোর বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ (সুন্দরবন) ও সৃজিত উপকূলীয় বন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে।[১২৬] প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ হ্রাসসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন অপরিহার্য হলেও এর সুরক্ষা বাংলাদেশে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নয়। বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বন অধিদপ্তর ক্ষমতা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা ও এর কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ। বনভূমি সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ উদ্যোগও দৃশ্যমান নয়।[১২৭] এই অধ্যায়ে বন ও বনভূমি সুরক্ষায় বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ঘাটতি

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে বন ও বনাঞ্চল রক্ষা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুপস্থিত। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা ছাড়া বন ও বনাঞ্চল রক্ষা করাও সম্ভব নয়।[১২৮] প্রাপ্ত তথ্য মতে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাবে বিশেষকরে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার অবক্ষয়িত বনাঞ্চলের পুনবায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম কার্যত প্রায় বন্ধ রয়েছে।

৩.২ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ

বন অধিদপ্তর একবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত 'রূপকল্প ২০২১[১২৯]' এবং 'রূপকল্প ২০৪১[১৩০]' বাস্তবায়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে এসব লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক ও কর্মকর্তাদের একাংশের প্রতিশ্রুতি ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩১] কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের বন ও বনাঞ্চলের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কর্মীদের কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য উপেক্ষা করে সরকারের অভিপ্রায়ে সরকারি, সামরিক, আধা-সামারিক ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার স্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের জমি বরাদ্দ প্রদানের ঘটনায় প্রায় নীরব ভূমিকা ও সম্মতি প্রদানের উদাহরণ বিদ্যমান। বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নীচে আলোচনা করা হলো:

৩.২.১ বন ও বন বিভাগ অগ্রাধিকার না পাওয়া

প্রাপ্ত তথ্য মতে, সরকারি বন ও বনজ-সম্পদ উজাড় ও বেদখল হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় ও উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিদের একাংশের দায় রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সরকারি অবকাঠামো নির্মাণে (যেমন- সড়ক ও মহাসড়ক, রেললাইন, সেনাবাহিনীর স্থাপনা, সরকারি স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি) সহজপ্রাপ্য হিসেবে বনের জমি ব্যবহার করা হয়। সরকারি কাজে নির্মাণে জমির প্রয়োজন হলে বনের জমিকে সহজলভ্য হিসেবে বিবেচনা করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।[১৩২] কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার বন বিভাগকে অবহেলার চোখে দেখে এবং কিছু ক্ষেত্রে বনের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে (বক্স ১)।[১৩৩]

---

[১২৬] বিস্তারিত দেখুন: বিবিসি- https://www.bbc.com/bengali/news-50367744, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯; প্রথম আলো- https://bit.ly/30hEN9m, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯; ডয়েচে ভেলে- https://bit.ly/2TeOBjf, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯; বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2Nngfqx, সর্বশেষ ভিজিট: ২ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১২৭] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১২৮] তথ্যসূত্র: দু'জন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক, উপ-প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন ডিএফও।

[১২৯] অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'রূপকল্প ২১' ঘোষণা করে। এই রূপকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ২০২১ সালের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনের কথা রূপকল্পে বলা হয় যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

[১৩০] 'রূপকল্প ২০২১' এর ধারাবহিকতায় বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগ তাদের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করে। এ রূপকল্পে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদে পরিণত হবে। রূপকল্প ২০৪১ এ ২৬টি লক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই সমাধানের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

[১৩১] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[১৩২] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন ফরেস্টার, টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

[১৩৩] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

বক্স ১

> "বন অধিদপ্তর সরকার কিংবা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কোনো অগ্রাধিকার তালিকায় নেই। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড অগ্রাধিকার পায় নি। বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কাঠামোগতভাবে অস্পষ্ট। বন ও বন সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যক্রম জ্বালানী কাঠ, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, সামাজিক বনায়ন, ইকু-ট্যুরিজম ইত্যাদির মধ্যে আবর্তিত হয়। কিন্তু বন কার্যক্রমের জন্য কখনো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে জোনিং ও প্ল্যানিং করা হয় নি।"- একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য।

বন বিভাগের প্রতি সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অবহেলার কারণে ব্যক্তি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বনের জমি দখলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎসাহ পায়।[১৩৪] লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধ্যানের লক্ষ্যে 'সিসমিক জরিপ' পরিচালনার জন্য মার্কিন কোম্পানি শেভরনকে সরকার অনুমতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর সরকারকে উক্ত বনে সিসমিক জরিপ না করার জন্য অনুরোধ করলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকরা তাতে কর্ণপাত করে নি বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থাপনা নির্মাণে সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোরও নজর থাকে বনের জমির ওপর এবং সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলো বনের জমি ব্যবহারে অসতর্ক বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৫] যাদের যখন জমি প্রয়োজন তারা বিভিন্নভাবে প্রভাব কাজে লাগিয়ে সরকারের কাছ থেকে বনভূমির জমি বরাদ্দ নেন। সুতরাং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বন ও বন অধিদপ্তর অগ্রাধিকার পায় না (বক্স ২)।

বক্স ২

> "১৯৮৫ সালে মধুপুর উপজেলাস্থ সরকারি সংরক্ষিত শালবনের অভন্তরে 'মধুপুর-রসুলপুর ফায়ারিং রেঞ্জ' নামে বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক স্থানীয় শালবনের অস্তিত্ব, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। সরকার সংরক্ষিত বনভূমির ৩০৫ একর জমি বিমান বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে। ফায়ারিং ও বোম্বিং এর বিকট শব্দে পার্শ্ববর্তী শালবন এলাকার বন্যপ্রাণী আতঁকে ওঠে। ফায়ারিং এর উচ্চশব্দের কারণে ইতোমধ্যে স্থানীয় গেছোবাঘ, বন্যশূকর ও বনবিড়ালসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী হারিয়ে গেছে। এছাড়া উক্ত রেঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকার শালবন স্থানীয় মানুষ ও প্রভাবশালীদের দ্বারা উজাড় হয়েছে এবং তা উদ্বেগজনকভাবে অব্যাহত রয়েছে।" - একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য (টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

৩.২.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আন্তরিকতার ঘাটতি

বন অধিদপ্তরের সমস্যা সমাধানে বন অধিদপ্তরের অভিভাবক হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করা যায়।[১৩৬] বন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা ও তাগিদ দেওয়া হলেও এসব বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে যথোপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ রয়েছে।[১৩৭] প্রাপ্ত তথ্য মতে, মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একাংশ অধিদপ্তর হতে প্রেরণ করা বনকর্মীদের দাবি-দাওয়া ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নথি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষেত্র বিশেষে আগ্রহী হন না এবং এসব নথি বছরের পর কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ে পড়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৮]

৩.২.৩ বন অধিদপ্তরের মতামত উপেক্ষা করে বনের জমি বরাদ্দ প্রদান

বন অধিদপ্তর হতে কোনো প্রস্তাব গেলে তা যথাযথভাবে যাচাইয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা ও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে বলে অভিমত রয়েছে।[১৩৯] বনবিদ্যা একটি বিশেষায়িত শিক্ষা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কর্মীর ঘাটতি থাকায় ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন না বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৪০] উদাহরণস্বরূপ, রামুতে বন বিভাগের জমি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব যায়। মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তরকে অবহিত না করে সেনানিবাস ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণের জন্য বনের জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য সম্মতি দেয়, অথচ বনের এই অংশটি বন্যহাতির অভয়ারণ্য। বন অধিদপ্তর থেকে এই অবকাঠামো নির্মাণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর পরও বন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১৪১]

৩.২.৪ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ঝুঁকি উপেক্ষা

---

[১৩৪] তথ্যসূত্র: বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খুলনা অঞ্চল; জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকের একজন সিনিয়র রিপোর্টার।

[১৩৫] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১৩৬] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক, ডিএফও ও এসিএফ।

[১৩৭] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, একজন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন উপ-বন সংরক্ষক - ঢাকা অঞ্চল।

[১৩৮] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও ডিএফও (খুলনা অঞ্চল)।

[১৩৯] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[১৪০] তথ্যসূত্র: উপ-প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন ডিএফও।

[১৪১] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

কোনো এলাকা বা বনাঞ্চল বা দ্বীপ কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা চিহ্নিত না করার পাশাপাশি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব যাচাই সমাপ্ত করার আগেই সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে বনের জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার উদাহরণ রয়েছে (বক্স ৩)।

বক্স ৩

- কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় বন্য হাতির আবাসস্থল ও চলাচলের পথে সেনানিবাস নির্মাণ, ঘাটাইল সেনানিবাস স্থাপনে বন বিভাগের প্রায় ৩০৫ একর জমি হস্তান্তর, কক্সবাজার জেলার পেচারদ্বীপ এলাকায় প্রায় একশত একর বন বিভাগের জমিতে নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি নির্মাণে সরকার বন্দোবস্ত প্রদান করেছে;
- কক্সবাজারের শীলখালী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে বন অধিদপ্তরের অনুমতি ছাড়া দুই থেকে তিন হাজার বড় আকারের গর্জন গাছ কাটা হয়। সরকার ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চাইলে গর্জন গাছগুলো রক্ষা করে বিকল্প পথে এ সড়ক নির্মাণ করা যেতো;
- সরকার মীরেরসরাই উপজেলায় বন অধিদপ্তরের তিনশ শতাংশ জমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নিকট হস্তান্তর করে। এতে করে নির্মাণাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়েছে;
- সুন্দরবনের নিকটবর্তী এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবন ও জীববৈচিত্র্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। উল্লেখ্য, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা সুন্দরবনের ভেতরের নদী দিয়ে পরিবহন করায় তা ডলফিন, কুমির, অন্যান্য জলজ ও স্থলজ প্রাণীর অবাধ বিচরণ বাধা সৃষ্টি করবে। এর পাশাপাশি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চারিপাশে শিল্প-কলকারখানা ও নগরায়ন গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি দ্বারা ইতোমধ্যে সুন্দরবন এর নিকটস্থ প্রতিবেশ ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

তথ্যসূত্র: গবেষণার মাঠজরিপ হতে প্রাপ্ত

উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সরকারি বনভূমির মধ্য দিয়ে বা বনের জমিতে সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে বিশেষকরে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে সামরিক ব্যারাক, ফায়ারিং রেঞ্জ, রানওয়ে ও নৌ-ঘাঁটি তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়ায় অস্তিত্বের সংকটে থাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য বিপন্ন ও উদ্বেগজনকভাবে সংকুচিত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে।[১৪২] এসব ক্ষেত্রে সরকার ভূমি অধিগ্রহণের একচ্ছত্র ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ও বন অধিদপ্তরের মতামত না নিয়ে বা আপত্তি অগ্রাহ্য এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদাহরণ রয়েছে।[১৪৩] উল্লেখ্য, সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অযুহাতে ও বন অধিদপ্তরের মতামত অগ্রাহ্য করে সাঙ্গু-মাতামহুরি সংরক্ষিত গভীর বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে মায়ানমার সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বনের পাহাড় ও গাছ কেটে সড়ক নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এর ফলে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত পাহাড়ি বন উজাড়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।[১৪৪]

৩.২.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত ও বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া সংরক্ষিত বন ঘোষণা

বননির্ভর স্থানীয় জনগণ ও বনবাসী জনগোষ্ঠীর কোনো মতামত ও পরামর্শ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা বনাঞ্চল বা বনের আংশিক এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৪৫] উল্লেখ্য, সরকার ১৯৬২ সালে মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা করা হয় তখনো মধুপুর বনের আধিবাসীরা কিছু জানতে পারে নি। সরকার ১৯৬২ সালে মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা করা হয় তখনো মধুপুর বনে বসবাসরত আদিবাসীরা তা জানতে পারে নি।[১৪৬] বন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সাথে বসে কোনো পরামর্শ করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৪৭]

৩.২.৬ উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন না হওয়া

বন খাতের 'মাস্টার প্ল্যান' (১৯৯৬-২০১৫)-এর একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশ হবে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি।[১৪৮] দেশে ১০ শতাংশ বা এর অধিক গাছের ঘনত্ব সম্পন্ন

[১৪২] তথ্যসূত্র: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ ও একজন পরিচালক।

[১৪৩] তথ্যসূত্র: একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা, উপ-প্রধান বন সংরক্ষক ও একজন ডিএফও - চট্টগ্রাম অঞ্চল

[১৪৪] তথ্যসূত্র: একজন ডিএফও- চট্টগ্রাম অঞ্চল।

[১৪৫] তথ্যদাতা: দু'জন এনজিও প্রতিনিধি, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

[১৪৬] প্রাগুপ্ত।

[১৪৭] প্রাগুপ্ত।

[১৪৮] ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-২৭৫, বিস্তারিত: http://www.plancomm.gov.bd, সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ অক্টোবর ২০১৯।

বনায়ন ১৯.২১ শতাংশে উন্নীত হলেও তা যথেষ্ট নয়।[১৪৯] দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দেশের বনসম্পদের সম্প্রসারণ করা আশানুরূপ হয় নি।

৩.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব

৩.৩.১ বন আইন ১৯২৭ (২০০০ সালে সংশোধিত)

'বন আইন ১৯২৭' মূলত বনজ সম্পদ ও রাজস্ব আহরণ কেন্দ্রীক ও বৃটিশ আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি আইন; এই আইনের দ্বারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা ও বন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। বন থেকে নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় করার লক্ষ্যে ১৯২৭ সালে ভারত উপমহাদেশের জন্য প্রথম বন আইন প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষ ২০০০ সালে সংশোধিত হলেও তা আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এটি ব্রিটিশ আমলের আইন। ব্রিটিশ-ভারত শাসনামলে বন সংক্রান্ত অপরাধগুলোর সাথে বর্তমান বন অপরাধের ধরন ও ব্যপ্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯২৭ সালের বন আইনে যেসব অপরাধের ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল প্রধানত: গাছের ছাল-বাকল তোলা ও গাছের ডালপালা কাটা বিষয়ক। এছাড়া বন বিভাগ দ্বারা বনজ সম্পদ হতে সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে মূলত বৃটিশ-ভারতের প্রথম বন আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে বর্তমানে জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনকেন্দ্রিক সংঘটিত অপরাধের ধরণ পরিবর্তিত হয়ে বিনা অনুমতিতে সরকারি বনের গাছ কাটা, বনভূমি ও বনের জমি অবৈধভাবে দখল, বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচার, ইত্যাদি ঘটনার ব্যাপকতা স্পষ্ট।[১৫০] বন আইন সম্পর্কিত আরো কিছু পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

- বনের সংজ্ঞা, বনের ধরন, বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন কাজে বনের জমি ব্যবহার ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে আইনে কিছু উল্লেখ নেই, এ সংক্রান্ত বিধিমালাও অনুপস্থিত;
- গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংরক্ষিত বনের মর্যাদা রহিতকরণের সুযোগ (ধারা ২৭) রাখা হলেও এক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কী প্রক্রিয়ায় তা রহিত করা হবে তা আইনে অনুপস্থিত; ঢালাওভাবে বনভূমি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি;
- বনভূমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় রূপরেখা থাকলেও অবক্ষয়িত ও বেদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই, এ সংক্রান্ত বিধিও নেই;
- বিক্ষিপ্তভাবে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও এ সংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ বিধিমালা নেই;
- প্রতিবেশি দেশসমূহ বন আইনের ঘাটতি পূরণে সম্পুরক আইন প্রণয়ন করলেও (যেমন- ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, ইত্যাদি) বাংলাদেশে ক্ষেত্রে এমন আইন অনুপস্থিত;
- আইনে কোনো কেন্দ্রীয় ক্ষমতায়িত কমিটির উপস্থিতি বিষয়ে কিছু বলা হয় নি, তাছাড়া বন আইন প্রতিপালন সংক্রান্ত কোনো বিধিও নেই; বিক্ষিপ্তভাবে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদের বাধার মুখে 'বন আইন ১৯২৭' সংস্কার করা যায় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৫১] সর্বোপরি, বন মামলা পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরে পৃথক কোন ইউনিট নেই।

৩.৩.২ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২

সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষায় কী করা হবে তা আইনে উল্লেখ নেই; এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোনো বিধানও রাখা হয় নি। অপরাধ সংঘটনকালে কিংবা অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ/আলামত থাকা সত্ত্বেও আদালতের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘটনাস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করার ক্ষমতা অধিদপ্তরের নেই; এমতাবস্থায় বন বিভাগের কর্মীরা বন আইনের দোহাই দিয়ে তদন্ত কাজ করে থাকে যা আসলে বিধিবহির্ভূত। বন্যপ্রাণী অপরাধজনিত ঘটনা তদন্ত কে করবে তা উল্লেখ নেই। ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী আইনে প্রদত্ত বিনা পরোয়ানায় আটকের ক্ষমতা এই আইনে রহিত করা হয়েছে। একই সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াল্ডলাইফ স্কাউটদেরকে অস্ত্র দেওয়ার বিধান রহিত করা হয়। অভয়ারণ্যে বিনা অনুমোতিতে প্রবেশ বা অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা (ধারা ১৫) অমান্য করার শাস্তি বিষয়ে উল্লেখ নেই।

৩.৩.৩ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

ইটভাটা আইন প্রয়োগের ক্ষমতা মূলত সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগের। তাছাড়া সরকারি বনের জমিতে থাকা অবৈধ দখলদারিত্ব ও স্থাপনা উচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসনের ইচ্ছা ও সহায়তার ওপর বন অধিদপ্তরকে নির্ভর করতে হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা

[১৪৯] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও, খুলনা অঞ্চল।

[১৫০] তথ্যদাতা: একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা; একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার; ও একজন পরিচালক-বন মামলা, ঢাকা। একজন ডিএফও

[১৫১] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও বন বিভাগের কর্মরত বনকর্মীদের একাংশ।

স্থাপন করতে চাইলে এবং এতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আপত্তি না থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তারা সাহস পান না। এক্ষেত্রে সরকারি বনের ভেতরে ইট ভাটার অনুমোদন দিলেও অধিদপ্তরের কিছু করণীয় থাকে না বলে বনকর্মীদের অভিমত।[১৫২] এভাবে আইনবহির্ভূতভাবে ইট ভাটা স্থাপন ক্ষেত্র বিশেষে রোধ করা যায় না।

৩.৩.৪ করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২

করাত-কল আইন অনুযায়ী বনভূমির দশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো করাত-কলের অনুমোদন দেওয়া আইনসিদ্ধ নয়। এই আইন মানতে গেলে গাজীপুর অঞ্চলে কোনো করাত-কলের অনুমোদন দেওয়া যায় না, অথচ এ অঞ্চলে করাত-কল প্রয়োজন। ফলে বাস্তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন ভাঙ্গতে হয় বলে একজন বন কর্মকর্তার অভিমত। তবে এ সুযোগ নিয়ে দেশের প্রায় সকল সংরক্ষিত ও রক্ষিত সরকারি বনের ভেতর ও এর আশেপাশে বিধিবহির্ভূতভাবে করাত-কল গড়ে ওঠার উদাহরণ রয়েছে। করাতকল বিধিমালার প্রধান-প্রধান সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

সারণি ৬: এক নজরে করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালার সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বিষয়	ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ/প্রভাব
পৌর এলাকায় করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ (বিধি ৭ক)	▪ পৌর এলাকায় বিনাবাধায় করাতকল স্থাপন ও পরিচালনায় আইনি বাধা নেই; শালবন ও পাহাড়ি বনসমূহের মধ্যে থাকা পৌর এলাকা ও এর আশে-পাশে অবৈধ করাত-কলের অস্তিত্ব বিরাজমান
বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড ও এর অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ড বা উভয় দণ্ড (বিধি ১২)	▪ বন ও পরিবেশের ক্ষতির হিসাব করলে শাস্তির পরিমাণ খুব কম

প্রাপ্ত তথ্যে মতে, অবৈধভাবে করাত-কল গড়ে তোলার পর বন বিভাগ মামলা দিলে একটি এলাকার সকল করাত-কল মালিকগণ একজোটে বাদী হয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। রিটের খরচও তারা সবাই বহন করেন। এমতাবস্থায়, হাইকোর্ট হতে স্টে-অর্ডার এনে অবৈধ করাত-কলের কার্যক্রম বছরের পর বছর চালিয়ে করাত-কল মালিকরা লাভবান হয়। ফলে, কার্যত কেউই আইনের আওতায় আসে না। এক্ষেত্রে 'একটি মামলার ক্ষেত্রে শুধু একজন করাত-কল মালিক রিট আবেদন করতে পারবেন'- এই মর্মে নির্দেশনা জারি করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায়, অবৈধ করাত-কলের কার্যক্রম বন্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।[১৫৩]

৩.৩.৪.১ বন আইন প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ

বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ভিত্তি নেই।[১৫৪] জেলা পর্যায়ে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বন মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বন মামলা ছাড়াও অন্যান্য আদালতের বিচার কাজ পরিচালনা করার কারণে বন মামলার জন্য চাহিদামাফিক সময় দিতে পারেন না। এমতাবস্থায়, বন আদালতের কার্যক্রম সপ্তাহের এক দিনের অর্ধবেলা পরিচালনা করা করা হয় যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বন মামলা ও বন আদালত সম্পর্কিত গবেষণার আরো কিছু পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য:

৩.৩.৪.১.১ বিচারক সংকট: প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০টি মামলার (মিস কেস) সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ দেওয়া হলেও ম্যাজিস্ট্রেটের সময় স্বল্পতার জন্য আট থেকে ১০টি'র বেশি শুনানি হয় না। বন মামলার শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য থাকলেও অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেট না আদালতে অনুপস্থিত থাকলে কিংবা সময় স্বল্পতার কারণে শুনানী অনুষ্ঠিত না হলে মামলার বাদী ও সাক্ষীদের ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়।[১৫৫] বন আদালতের মাধ্যমে বছরে গড়ে একশটি মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, মূলত বিচারকের অভাবে বন মামলা নিষ্পত্তির হার কম। এছাড়া বন মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা নেই। এমতাবস্থায়, একটি মামলার নিষ্পত্তি হতে ক্ষেত্র বিশেষে ১৫ থেকে ২০ বছর লেগে যায়। সর্বশেষ তথ্য মতে, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তসারা দেশে বন সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৪৯ হাজার ৬টি, যার মধ্যে ৪৭ হাজার ৯৫০টি মামলার কার্যক্রম নিম্ন আদালতে এবং ১ হাজার ৫৬টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষায় বেশিভাগ (৯২.০৪%) 'পিওআর' মামলা।[১৫৬]

[১৫২] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ; একজন বিট কর্মকর্তা - টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

[১৫৩] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - টাঙ্গাইল বন বিভাগ ও একজন পরিচালক- বন অধিদপ্তর।

[১৫৪] এখানে উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, বন্দর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মামলার বিচার কাজ পরিচালনার জন্য পৃথক আদালত রয়েছে।

[১৫৫] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার ও একজন বিট অফিসার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[১৫৬] তথ্যদাতা: একজন বন অধিদপ্তরের লিগ্যাল ইউনিটের কর্মী, একজন কর্মকর্তা, একজন সহকারী বন সংরক্ষক - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

সারণি ৭: বন অপরাধ সংক্রান্ত চলমান মামলার ধরণ ও সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

আদালত ও বিচারাধীন মামলার ধরন		মামলার সংখ্যা	শতকরা হার
নিম্ন আদালতে	দেওয়ানী	২,৯২২টি	৬.০৯
	পিওআর	৪৪,১৩৪টি	৯২.০৪
	সার্টিফিকেট	৮৮৪টি	১.৮৪
	বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট মামলা	১০টি	০.০২
	মোট	৪৭,৯৫০টি	১০০.০০
উচ্চ আদালতে	রিট মামলা	৭৭৫টি[১৫৭]	৭৩.৩৯
	কনটেম্পট (রিট মামলা হতে উদ্ভুত)	৩টি	০.২৮
	হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল মামলা	২৬০টি	২৪.৬২
	সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মামলা	১৮টি	১.৭০
	মোট	১,০৫৬টি	১০০
মোট মামলা (নিম্ন ও উচ্চ আদালতসহ): ৪৯,০০৬টি			

তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের লিগ্যাল ইউনিট হতে প্রাপ্ত

সাধারণত ভূমি জরিপ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বন মামলা ঝুলে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা টাকা দিয়ে মামলাকে দীর্ঘায়িত করে। এর মধ্যে তারা আশেপাশের আরো বনভূমি দখল করে সেখানে শিল্প কারখানা স্থাপন করে। আর দীর্ঘদিন পর যে রায় দেওয়া হয় তা দায়সারাগোছের বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৫৮]

৩.৩.৪.১.২খণ্ডকালীন আইনজীবী দিয়ে মামলা পরিচালনা: বন অধিদপ্তরের নিজস্ব বা প্যানেল উকিল বা রিটেইনার নেই। 'রিটেইনার'[১৫৯] দিয়ে বন মামলা পরিচালনা করা হয়। হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিটের উত্তর দেওয়ার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব আইন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী বন অধিদপ্তরে নেই। হাইকোর্টে রিট হওয়া বন মামলাগুলোর তদারকি উকিলের মাধ্যমে করা হয়। নিম্ন আদালতে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বন মামলা লড়তে সক্ষম এমন আইনজীবীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো প্যানেল নেই। ভূমির জটিলতা বিষয়ে সম্যক ধারণা আছে বন বিভাগে এমন যোগ্য লোকের ঘাটতি প্রকট বলে গবেষণার তথ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া রিটেইনার হিসেবে যারা বন মামলা লড়েন তাদের বেশিরভাগের বন আইন সম্পর্কে ধারণা নেই বলে অভিমত রয়েছে।[১৬০]

৩.৩.৪.১.৩ মামলার বাদী সংক্রান্ত জটিলতা: বন মামলার বাদী/সাক্ষী তথা বনকর্মী সরকারি চাকরি নিয়ম মোতাবেক প্রতি দুই বছর সময় অন্তর বাদি হন। এমতাবস্থায় মামলার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হলে সংশ্লিষ্ট মামলার সাক্ষী নিজ কার্যালয়ে কাজে চাপ, ব্যয়বহুল যাতায়াত, চাকরি হতে অবসর গ্রহণ কিংবা মৃত্যুবরণের কারণে ক্ষেত্র বিশেষে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নিজের দায়েরকৃত বন মামলার কার্যক্রমে উপস্থিত হতে পারেন না।

৩.৩.৪.১.৪মামলার আনুষাঙ্গিক খরচবাবদ বরাদ্দ নেই: বন মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ও পৃথক কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। মামলার আনুসঙ্গিক খরচ, যেমন- নথিপত্র তৈরি, কম্পোজ করা, আসামি আদালতে নেয়া, কোর্টে চালান করা, শুনানীর দিন আদালতে আমাদের হাজিরা দিতে উপস্থিত থাকা ইত্যাদিবাবদ ব্যয় মামলার বাদী (বনকর্মী) প্রথমে নিজের পকেট হতে ব্যয় করেন। এরপর তার কর্মস্থল সংশ্লিষ্ট ডিএফও অফিসে বিল আকারে জমা দেওয়া হয়। এছাড়া মামলার বাদীরা (বনকর্মী) দৈনিক পারিতোষিক দেওয়া হলেও তা আকর্ষণীয় নয় বলে মামলা বাদী হিসেবে দায়ত্বপালনকারী বনকর্মীদের অভিমত।[১৬১]

৩.৩.৪.১.৫ আকর্ষণীয় রিটেইনার ভাতা না থাকা: বন মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রিটেনারদেরকে নামমাত্র ফি দেওয়া হয়। বন মামলার রিটেইনারদের জন্য ২০০৩ সাল হতে অর্ধ ও পূর্ণ দিবস ও মাসিক নির্ধারিত ফি যথাক্রমে ১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা ও ১,৫০০ টাকা।[১৬২] এই ফি গ্রহণের বিনিময়ে বন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রথিতযশা আইনজীবীদের কেউ বন মামলা পরিচালনায় তথা রিটেইনার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হন না। অর্থাৎ আকর্ষণীয় ফি দিতে না পারায় উচ্চ আদালতে বন মামলায় জেতার জন্য ভালো উকিল নিয়োগ করা যায় না। অপরদিকে, বন মামলার বিশেষে করে বনভূমি অবৈধভাবে দখলকারী প্রভাবশালী বিবাদীরা আকর্ষণীয় পারিতোষিকের বিনিময়ে দক্ষ ও প্রথিতযশা আইনজীবীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে যাদের সাথে নামমাত্র পারিতোষিকে নিযুক্ত

[১৫৭] করাতকল সংক্রান্ত: ২৯০টি; ভূমি সংক্রান্ত: ২২৭টি; সার্টিফিকেট সংক্রান্ত: ২৪টি; ইটভাটা সংক্রান্ত: ১১টি; বিবিধ বিষয়ে রিট: ১০৫টি; চাকরি সংক্রন্ত রিট: ১১৮টি।

[১৫৮] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, টাঙ্গাইল বন বিভাগ; একজন পরিচালক; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[১৫৯] পরিতোষিক দিয়ে বন মামলায় সম্পৃক্ত উকিল।

[১৬০] তথ্যদাতা: বন মামলার বাদী ও বন মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একাংশ।

[১৬১] তথ্যসূত্র: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার ও একজন পরিচালক - বন মামলা।

[১৬২] স্মারক নম্বর ১৭৯০/সলিসিটর/২০০২, তারিখ: ১৫.০৩.২০০৩ ও স্মারক নম্বর ১০০১/সলিসিটর/৯২-২০৫১, তারিখ: ৩০-০৬-১৯৯৩, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সরকারি পক্ষের রিটেইনাররা যুক্তিতর্কে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। এমতাবস্থায়, অনেক ক্ষেত্রে মামলার রায় বন বিভাগের অনুকূলে আসে না। এ প্রসঙ্গে একজন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তার মতে, বন বিভাগ মামলা দিয়েও বনের জমির অবৈধ দখল ঠেকানো যাচ্ছে না, কারণ নিম্ন আদালতে হেরে যাওয়ার পর প্রভাবশালীরা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। এক্ষেত্রে মোটা অংকের টাকা দিয়ে তারা প্রভাবশালী ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করে, কিন্তু বন অধিদপ্তরের এই সক্ষমতা নেই।[১৬৩] এমনকি উচ্চ আদালতে গেলে মামলার প্রয়োজনে বনকর্মীদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিজেদের পকেট হতে টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৬৪]

৩.৩.৪.১.৬ মামলার সাক্ষীদের ভাতা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই: বন সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোনো ভাতা নেই। এ কারণে মামলার সাক্ষী হওয়াকে বনকর্মীদের একাংশ ঝামেলা ও নিজের পকেটের টাকা খরচ হিসেবে দেখে। এ কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক চোর বা দখলকারীদের সাথে আতাঁতের অভিযোগ রয়েছে।[১৬৫]এছাড়া মামলায় জেতার জন্য তৎপর হতে বনকর্মীদের উৎসাহিত করতে প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই।[১৬৬]

৩.৩.৪.১.৭মামলা নিয়ে হতাশা: বনকর্মীরা নিজেদের/বাদীর খরচে আসামিদের ধরে কোর্টে চালান দেন। আসামি ধরা ও তাদের আটকে রাখা কষ্টকর। ক্ষেত্র বিশেষে বন মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হলে তাকে কার্যত কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বন মামলার আসামিরা কোর্টে চালান দেওয়ার আগেই জামিন পেয়ে যায়। এসব কারণে বনকর্মীদের মধ্যে বন মামলা নিয়ে হতাশা কাজ করে।

৩.৩.৪.১.৮ সরকারি প্রধান আইন কর্মকর্তার ভূমিকা: বন ও বনভূমি দখল ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে মামলা করে লাভ হয় না। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা আদালতকে ম্যানেজ করে মামলা থেকে রেহাই পেয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, একটা মামলা নিয়ে সাবেক একজন প্রধান বন সংরক্ষকে আর্টনি জেনারেল ফোন করে তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষককে (ধমকের সুরে) বলেন, "যে বনভূমির জমির জন্য মামলায় লড়ছেন সেই জমিতে বন রেখে দেশের কত টাকা আয় হবে? এরচেয়ে শতগুণ বেশি আয় হবে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে।"[১৬৭]

৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.৪.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.৪.১.১ সনাতন পদ্ধতিভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখে প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- রিমোট সেনসিং) ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত উদ্যোগ অনুপস্থিত। এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে অধিদপ্তরের একাংশের মধ্যে ভীতি ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনাকে (যথা- বন টহল) বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান জনবলের (১০,৩২৭টি) প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অধিদপ্তরের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর একটি প্রস্তাবনা (১৭,৮২০টি) বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের বন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব করা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা ও ভিত্তি না ধরে শুধু পাটিগাণিতিক হিসাব কষে বিদ্যমান প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামোর স্থলে নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করে তা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৬৮] সনাতন পদ্ধতিতে বন ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ব্যয় এবং বনকেন্দ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির উচ্চ ঝুঁকি ও সুযোগ বিদ্যমান। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো অনুমোদন করা হলে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত কোনো পরিবর্তন না হওয়া এবং বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

৩.৪.১.২ জনবল ঘাটতি: দেশের বন ও বনভূমি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও সনাতন পদ্ধতি-নির্ভর। স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে বন সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে পরিমাণ জনবল অধিদপ্তরের প্রয়োজন তা নেই। লোকবলের সংকটের কারণে বন অধিদপ্তরের বনায়ন (চারা উৎপাদন, বাগান তৈরি ও গাছ লাগানো, ইত্যাদি), বন টহল ও আইনের প্রয়োগ কার্যক্রম ব্যাহত হয়।[১৬৯] যাহোক সনাতন পদ্ধতি-ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, ফরেস্ট রেঞ্জার ও ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যথাক্রমে ৮১.৪ শতাংশ ও ৯৯.১ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়াও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (নবম গ্রেড পর্যন্ত) ৭১.৯ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে, তাদের মধ্যে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য কর্মকর্তা ও বন্যপ্রাণী পরিদর্শক সহ কয়েকটি

[১৬৩] তথ্যদাতা: একজন সহকারী বন সংরক্ষক - কেন্দ্রীয় সার্কেল।

[১৬৪] তথ্যদাতা: একজন সহকারী বন সংরক্ষক - কেন্দ্রীয় সার্কেল।

[১৬৫] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[১৬৬] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[১৬৭] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[১৬৮] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[১৬৯] তথ্যদাতা: একজন এসিএফ - কেন্দ্রীয় সার্কেল, মহাখালী, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ পদে অনুমোদিত পদের বিপরিতে কোনো জনবল নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৪৮.১ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সার্বিকভাবে ২৯.১ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। গবেষণার পর্যবেক্ষণ মতে, প্রতিবেশি দেশ ভারত ও উন্নত দেশসমূহের মতো বাংলাদেশের বনভূমি ব্যবস্থানা প্রযুক্তি-নির্ভর না হওয়া বা না করার জন্য জনবল সংকটের অন্যতম কারণ।

৩.৪.১.৩ ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ: বন অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই। একটানা প্রায় ১৬ বছর (১৯৮৫ থেকে ২০০২) ক্যাডার পদে লোক নিয়োগ না হওয়ায় উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মীর সংকট তৈরি হয়েছে। সামনে দিনগুলোতে কতজন অবসরে যাবেন এবং নতুন কতজন নিয়োগ দিতে হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগে কোনো ধারাবাহিকতা নাই, যা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে।[১৭০] অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় জনবল প্রয়োজন তা যথাযথভাবে যাচাই না করে কিংবা সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা তা আমলে না নিয়ে ক্যাডার পদে নিয়োগে সুপারিশ করে থাকে।[১৭১]

৩.৪.১.৪ পদোন্নতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ: বন অধিদপ্তর হতে যথাসময়ে পদোন্নতির সুপারিশ করা হলেও সে প্রস্তাব বছরের পর বছর মন্ত্রণালয়ে পড়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১৭২] বন বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে পদোন্নতি নিয়ে হতাশা বেশি (বক্স ৪)। কোনো কোনো কর্মী যে পদে যোগ দিয়েছেন তাদের অনেকেই সে পদ থেকে অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ১৯৮৫ সালে উপজেলা প্ল্যানটেশন অফিসার থেকে পদোন্নতি পেয়ে যেসব কর্মী ফরেস্টার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই ফরেস্টার হিসেবে এখনো নিয়োজিত। ২০ থেকে ২৫ বছর একই পদে চাকরি করার কারণে কোনো কোনো কর্মীর মানসিকতায় বন রক্ষার পরিবর্তে অনিয়মের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে অভিমত রয়েছে।[১৭৩]

> **বক্স ৪**
>
> "জন্ম থেকে জ্বলছি। চাকরিতে যোগদানের শুরু থেকে যে পদে ঢুকেছি সে পদেই আছি।"- একজন ফরেস্ট রেঞ্জার (কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ)
>
> "১৯৯১ সালে ফরেস্টার হিসেবে বন বিভাগের যোগদান করে একই পদে চাকরি করছি। এজন্য এখন আর কোনো অনুপ্রেরণা পাই না।"- একজন ফরেস্টার (কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ)
>
> "ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মেরুদণ্ড ফরেস্টার। একজন ফরেস্টের কখনও লেবার, অফিসার এবং কখনো মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নকারী। বছরের পর বছর একই পদে থেকে কাজের অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলছে।"- একজন ডিএফও (চট্টগ্রাম অঞ্চল)
>
> "২০০০ সালে আমাকে উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে নেওয়া হয়, কিন্তু অদ্যাবধি আমাকে কোনো সিনিউরিটি দেওয়া হয় নি। আর আমার পরে যারা ক্যাডার সার্ভিসে যোগ দিয়েছে তাদের সবাই পদোন্নতি পেয়েছে"- একজন ফরেস্ট রেঞ্জার (কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ)

৩.৪.১.৫ বদলি ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ: সরকারের অন্যান্য অধিদপ্তরের ন্যায় বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলির মেয়াদ/স্টেশনে চাকরিকাল সাধারণত তিন বছর, তবে দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে স্টেশনে চাকরিকাল দুই বছর নির্ধারণ করা আছে।[১৭৪] কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিধানের ব্যত্যয় দেখা যায়। রাজনৈতিক চাপ, স্বজনপ্রীতি, অভ্যন্তরীণ চাপ ও দুর্নীতির মাধ্যমে স্টেশনে চাকরিকাল পূর্ণ না করে বদলি হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লোভনীয় স্টেশনগুলোতে বদলি/পদায়নের অভিযোগ রয়েছে।

৩.৪.১.৬ জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে বৈষম্য: 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১' এবং 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা ১৯৮৩' এর আলোকে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণপূর্বক পদোন্নতির জন্য যোগ্য হয়, যার আলোকে বিভিন্ন পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ড[১৭৫] কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়। সরকারি চাকরি বিধিমালা মোতাবেক

---

[১৭০] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[১৭১] তথ্যদাতা: একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - খুলনা সার্কেল।

[১৭২] তথ্যদাতা: একজন সহকারি প্রধান বন সংরক্ষক; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার ও একজন দু'জন বিট অফিসার, কক্সবাবার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[১৭৩] তথ্যদাতা: একজন বিট কর্মকর্তা - সুন্দরবন দক্ষিণ বন বিভাগ।

[১৭৪] তথ্যসূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকুত পরিপত্র নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯ অনুযায়ী "একজন কর্মকর্তার প্রতি স্টেশনে চাকরিকাল হবে তিন বৎসর (দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর)। ঢাকার বাইরে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি, বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন-এই তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তিন বছরের পূর্বে (দূর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর) বদলী করতে হলে বিষয়টি একজন মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে বিবেচিত হতে হবে।" [তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত চাকরির বিধানাবলী (বর্ধিত ও সংশোধিত), রোদ্দুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩০৩]।

[১৭৫] পদোন্নতি ও নিয়োগ কমিটির গুলোর মধ্যে 'সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড', বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ড', '৭ম, ৮ম, ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি', 'দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি', 'বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি', 'ডিভিশনাল সিলেকশন বোর্ড' ইত্যাদি। তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত চাকরির বিধানাবলী (বর্ধিত ও সংশোধিত), রোদ্দুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭৩-২৮০।

উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে যোগদান করামাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মীর সার্ভিসকাল গণনা করে জ্যেষ্ঠতা পাওয়ার বিধান থাকলেও অধিদপ্তরে তার ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে একজন বনকর্মীর তা পেতে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় বিলম্বিত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়ন খাতের কর্মীদের রাজস্ব খাতে অর্ন্তভুক্ত করা হলেও দীর্ঘদিন তাদেরকে জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি দেওয়া হয় নি।[১৭৬]

৩.৪.১.৭ পদ-মর্যাদা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ: বন অধিদপ্তরে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা সরকারি অন্যান্য অধিদপ্তরে/বিভাগে কর্মরত সমমানের ডিগ্রিধারী কর্মীদের পদমর্যাদার তুলনায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নার্সিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা দশম গ্রেডে (দ্বিতীয় শ্রেণীর সমতুল্য) বেতন-ভাতা পেলেও সমমানের ডিগ্রি নিয়ে বন অধিদপ্তরের কর্মীরা ১৫ গ্রেডের বেতন স্কেলের (চতুর্থ শ্রেণীর সমতুল্য) পদমর্যাদা ভোগ করছেন। এতে বন অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী কর্মীরা বেতন, সরকারি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। পদ মর্যাদার কারণে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তযোগাযোগ ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পদ মর্যাদায় বৈষ্যমমূলক অবস্থান রয়েছে, যেমন- উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা (অষ্টম-নবম গ্রেড) ও ফরেস্ট রেঞ্জারের (দশম-দ্বাদশ) পদমর্যাদা। পদমর্যাদা সমান বা কাছাকাছি হলে উপজেলা পর্যায়ে বন অধিদপ্তর ও সরকারি অন্যান্য অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ বিশেষ করে অবৈধভাবে দখলকৃত বনের জমি উদ্ধারে আরো কার্যকরভাবে সম্পন্ন হতো বলে অভিমত রয়েছে। সহকারী বন সংরক্ষক ও ডিএফওরা জেলা প্রশাসকদের সাথে বৈঠকে পদ মর্যাদাগত কারণে হীনমন্যতায় ভুগে থাকেন।[১৭৭]

৩.৪.১.৮ ক্যাডার ও নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব: বন অধিদপ্তরে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে।[১৭৮] **১৯৮৫** সালের পর ২০০২ সাল পর্যন্ত বিসিএস ফরেস্ট ক্যাডারে জনবল নিয়োগ বন্ধ থাকলেও এ সময় বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়ন খাতে জনবল নিয়োগ অব্যাহত থাকে। ১৯৮৯ ও ১৯৯৩ সালে অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত উন্নয়ন খাতের কর্মীদেরকে ২০০০ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়।[১৭৯] ফলশ্রুতিতে জ্যেষ্ঠতা নিয়ে বিসিএস ফরেস্ট সার্ভিসভুক্ত কর্মী ও এন-ক্যাডার (নন-ক্যাডার হতে পদোন্নতির দ্বারা ক্যাডার প্রাপ্ত) পাওয়া কর্মীদের মধ্যে সিনিয়োরিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ২০১৯ সালের শুরুতে এ দ্বন্দ্বের অবসান করা হয়েছে। উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে আসার পর যারা এন-ক্যাডার হয়েছেন তারা এসিএফ সমমর্যাদার বা নম্বর বেতন গ্রেডভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি বিসিএস ফরেস্ট ক্যাডার হতে নিয়োগপ্রাপ্তরা সিনিয়রিটি পাবেন বলে অধিদপ্তরের ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভুক্ত কর্মীরা ঐকমত্যে পৌঁছায়।

৩.৪.১.৯ প্রশিক্ষণের ঘাটতি: বনকর্মীদের চাহিদা যাচাই-পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

৩.৪.১.১০ অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধা: মাঠ পর্যায়ের দুর্গম এলাকাগুলোতে বনকর্মীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ কোনো চিকিৎসা ভাতা নেই। কেউ বড় ধরণের বা গুরুতর অসুস্থ হলে নিজের টাকায় কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সহকর্মীদের নিকট হতে আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে টাকা তুলে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।[১৮০]

৩.৪.১.১১ বিভাগীয় ব্যবস্থা: বনকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। অধস্তন কর্মীরদের একাংশ একজোট হয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করার অভিযোগ রয়েছে।

৩.৪.২ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

৩.৪.২.১ বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ বন সুরক্ষায় চ্যালেঞ্জ: রাজস্ব সংগ্রহ অধিদপ্তরের মূল কাজ না হলেও বন ও বনজসম্পদ হতে বিগত চার অর্থ বছরে গড়ে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে পূর্বের বছর থেকে ৫ - ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পারলে সংশ্লিষ্ট বন অফিস সম্ভাব্য কী কী কারণে পারে নি তা সিসিএফ দপ্তরকে জানানোর বাধ্যবাধকতা, যা নোট হিসেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া এবং তা অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর উপর চাপ সৃষ্টি প্রাকৃতিক বন রক্ষায় অন্যতম অন্তরায় ও দুর্নীতির ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি করছে। বনখাত হকে রাজস্ব সংগ্রহের এই লক্ষ্যমাত্রা বন রক্ষায় একটি অন্যতম অন্তরায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়মের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। রাজস্ব আহরণের নামে বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দুর্নীতিতে (যথা- প্রাকৃতিক বন কেটে সামাজিক বনায়ন, রাবার বাগান, ইকো-ট্যুরিজম, ইজারা প্রদান, জমি লিজ, কাঠ বিক্রয়, ইত্যাদি) জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৮১] কাঠ বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত বর্ধনশীল কিন্তু প্রাকৃতিক বন এবং স্থানীয় পরিবেশের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রজাতির গাছ দিয়ে বনায়ন করা হয়ে থাকে।

---

[১৭৬] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ; ও একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - ঢাকা বন বিভাগ।

[১৭৭] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক; একজন ডিএফও; একজন এসিসিএফ; একজন এসিএফ; একজন রেঞ্জার ও একজন বিট কর্মকর্তা।

[১৭৮] তথ্যদাতা: একজন এসসিসিএফ; একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় অঞ্চল; একজন ডিএফও, ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং ইউনিট।

[১৭৯] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকদের একাংশ।

[১৮০] তথ্যদাতা: একজন বনপ্রহরী - চাঁদপাই রেঞ্জ।

[১৮১] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্টার ও বিট কর্মকর্তা।

৩.৪.২.২ অফিস পরিচালন ব্যয় সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ: রেঞ্জ অফিস বা নীচের কোনো কার্যালয়ে সরাসরি অফিস পরিচালন ব্যয় বাবদ বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই। রেঞ্জ ও বিট অফিসসহ মাঠ পর্যায়ের এর নীচের অফিসগুলোর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্র হতে কোনো বরাদ্দ আসে কিনা, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ অবহিত নন। তবে রেঞ্জ অফিস থেকে চাহিদা দেওয়া হলে ডিএফও অফিস থেকে বরাদ্দ আসে। এক্ষেত্রে বিট অফিসগুলো অফিস সংস্কারে বরাদ্দের জন্য ডিএফও অফিসের কাছে চাহিদাপত্র জমা দিয়ে থাকে। তবে নির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ না করায় খাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদি ক্রয়সহ অতিথি আপ্যায়ন খরচ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মীদের নিজেদের পকেট হতে করতে হয়। উল্লেখ্য, একটি বিট অফিস হতে মাসে গড়ে পাঁচটি প্রতিবেদন, যেমন- মাসিক প্রতিবেদন, উপস্থিতি, মুভমেন্ট, বনের ম্যাপ, মোবাইল ট্রাকিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি নিজেদের পকেটের খরচে কম্পিউটারে কম্পোজ ও প্রিন্ট করে রেঞ্জ কর্মকর্তা বরাবর জমা দিতে হয়। এতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রতি মাসে গড়ে ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা ব্যয় হয়।[১৮২]

৩.৪.২.৩ মাঠ পর্যায়ে নগদে বেতন-ভাতা প্রদান: প্রথম হতে নবম গ্রেডভুক্ত সকল কর্মীর বেতন অনলাইনে প্রদান করা হলেও দশম হতে বিশতম গ্রেডের কর্মীদের বেতন ডিএফও হয়ে রেঞ্জারের মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। সকল বনকর্মীর জন্য এখনো সমন্বিত বাজেট একাউন্টিং সিস্টেম চালু হয় নি। এমতাবস্থায় মাঠ পর্যায়ে বিট অফিসার ও এর নীচের কর্মীদের বেতন হাতে বা নগদ ক্যাশ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বেতন হাতে পেতে চার-পাঁচদিন বিলম্ব হয়। মাঠ পর্যায়ে নগদে বেতন-ভাতা বণ্টন ব্যবস্থা অধিদপ্তরে দুর্নীতির সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করছে বলে অভিমত রয়েছে।[১৮৩]

৩.৪.২.৪ বন সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অপ্রতুল বরাদ্দ: বনায়ন বন অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ অনুপস্থিত, যেমন- বাগান সৃজন/বনায়ন কাজে গাছ প্রতি বরাদ্দ বর্তমানে ১৭ টাকা অথচ এই কাজে গাছ প্রতি ন্যূনতম ২৫ থেকে ৩০ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যাশা-মাফিক বাগান সৃজন কাজ ব্যাহত হয়।

৩.৪.২.৫ বন মামলা পরিচালনায় অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ: বন মামলা পরিচালনার জন্য পৃথক বাজেট ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বরাদ্দ নেই। নিম্ন আদালতে বন মামলা পরিচালনায় অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস ও মাসিক রিটেইনার ফি (আইনজীবীদের ভাতা) যথাক্রমে ১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা ও ১,৫০০ টাকা।

৩.৪.২.৬ ঝুঁকি ভাতা: সুন্দরবন ও তিনটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত বন কার্যালয়সমূহে দায়িত্বপালনরত বনকর্মীদের জন্য 'দুর্গম ভাতা' (পূর্বের বেসিক বেতনের ২০%) থাকলেও দুর্গম চরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ভাতা নেই। এতে কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হন না। আবার কোনো কোনো ইউনিট এই ভাতা পায় আবার কোনো কোনো ইউনিট পায় না, যেমন- বনপ্রহরী ও বোটম্যানদের ঝুঁকি ভাতা থাকলেও বন বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের কোনো ঝুঁকি ভাতা নাই। এ নিয়ে অন্যান্য ইউনিটে ক্ষোভ আছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনকালে আঘাতপ্রাপ্ত হলে সরকারিভাবে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন দস্যুদের দ্বারা কেউ নিহত হলেও সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৮৪]

৩.৪.৩ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। এর ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছু উদাহরণ:

৩.৪.৩.১ মাঠ পর্যায়ে অফিস অবকাঠামোর ঘাটতি: গবেষণার আওতায় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন করা অধিকাংশ রেঞ্জ, বিট, চেক স্টেশন, ক্যাম্প ও ফাঁড়িগুলোর অবকাঠামোগত সুবিধা, যেমন- কর্মীদের বসার কক্ষ, সভাকক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, স্টোররুম, অতিথিদের অপেক্ষা বা বসার স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো এলাকায় বনকর্মীদের একাংশকে সাধারণ মানুষের পরিত্যাক্ত বাড়ি নিজেদের উদ্যোগে ও নিজ টাকা খরচ করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন উদাহরণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিট অফিসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ভবন বা ঘর বরাদ্দ বা ব্যবস্থা না থাকায় সংশ্লিষ্ট বনকর্মীদের নিজ উদ্যোগে স্থানীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবন কিংবা ঘরের একটি বা দু'টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে বিটের কার্যক্রম চালানো হয়।[১৮৫] কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিট কার্যালয় সরকারি পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ ভবনে কার্যালয় স্থাপন করায় বনকর্মীদেরকে দুর্ঘটনায় পড়ার আতঙ্ক নিয়ে অফিস করতে হয়।[১৮৬] ফাঁড়ি বা চেকপোস্ট সাধারণত টিনের তৈরি ছাপড়া ঘর। এসব ঘরে সাধারণত কয়েকজন বন প্রহরী মিলে একটি কক্ষে বসবাস করে।[১৮৭] সার্বিকভাবে, মাঠ পর্যায়ে বিট অফিস ও এর নীচের কার্যালয়গুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট হতে যথোপযুক্ত উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

৩.৪.৩.২ উদ্ধার ও জব্দকৃত বনজ সম্পদ সংরক্ষণাগারের অভাব: বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো বনজ সম্পদ, চোরাই কাঠ ও বন্যপ্রাণী জব্দ ও উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে আসে। তবে এসব সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব সংরক্ষণাগার সুবিধা

[১৮২] তথ্যদাতা: একজন বিট কর্মকর্তা।

[১৮৩] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্টার ও বিট কর্মকর্তা।

[১৮৪] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্টার - শ্রীপুর রেঞ্জ।

[১৮৫] তথ্যদাতা: একজন এসিসিএফ, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়।

[১৮৬] তথ্যদাতা: একজন বিট কর্মকর্তা, কুতুবছড়ি রেঞ্জ, রাঙামাটি; বন প্রহরী, কুতুবছড়ি রেঞ্জ, রাঙামাটি; একজন ফরেস্টার, কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[১৮৭] তথ্যদাতা: একজন এসিসিএফ, প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর।

নেই। এমতাবস্থায়, জব্দ ও উদ্ধারকৃত গাছ, কাঠ, বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী স্থানীয় ফরেস্ট রেঞ্জ ও বিট কার্যালয়ের আসের আঙ্গিনা, মাঠ ও রাস্তার পাশে ও খোলা জায়গায় রাখতে হয়।[১৮৮] এভাবে অনির্দিষ্ট সময় ধরে খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখায় বনজ সম্পদ রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হয় এবং অনেক তা চুরি হয়। এছাড়া এতে সরকারের রাজস্ব আর্থিক ক্ষতিসহ মামলার আলামত ও গুরুত্ব কমে যায়।[১৮৯]

৩.৪.৩.৩ দুর্গম এলাকার বনকর্মীদের বিশেষ আবাসনের ব্যবস্থা নেই: দুর্গম এলাকার বিট, ক্যাম্প ও ফাঁড়িসমূহে কর্মরত বনকর্মীদের আবাসনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ি আবাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায় (বক্স ৫)।

বক্স ৫

"আমার ক্যাম্পের জায়গাটি নিরাপদ না। যেকোনো মুহূর্তে বাঘ আক্রমণ করতে পারে। প্রায়শ কুমির নদী থেকে উঠে এসে ঘরের দরজায় বসে থাকে। ক্যাম্পের চারদিকে কাঁটাতার বা দেওয়াল দিয়ে বাউন্ডারি দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া সরবরাহকারী নিম্নমানের ব্যাটারি সরবরাহ করায় সোলার প্যানেলের ব্যাটারি খারাপ হয়ে গেছে। মাত্র দুই-তিন ঘন্টা আলো পাওয়া যায়। বাকী সময় অন্ধকারে থাকতে হয়।"- একজন বনপ্রহরীর মন্তব্য (চাঁদপাই রেঞ্জ, সুন্দরবন দক্ষিণ বন বিভাগ)

৩.৪.৪ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি

বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি, যেমন- সার্ভেলেন্স ড্রোন, ট্রাকিং ডিভাইস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), স্যাটেলাইট ইমেজ, ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে মতে, এখনো সনাতন পদ্ধতিতে তথা মাঠ পর্যায়ে স্বশরীরে বন টহল, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় প্রায়শ বনকেন্দ্রিক অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে বন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না, কিংবা কর্মীদের একাংশের তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া বনভূমির জমির দলিল, রেকর্ডপত্র ও মানচিত্র, মামলার আলামত, ইত্যাদি এখনও সনাতন পদ্ধতিতে (পেপার-ভিত্তিক) সংরক্ষণ করায় নথি বিনষ্ট, চুরি ও হারিয়ে যাওয়ায় বনভূমি জবরদখলের ঝুঁকি ও সুযোগ তৈরি করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বন বিভাগের দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে সব পর্যায়ের অফিসে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রের অভাবে এ কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। অধিকাংশ রেঞ্জ ও প্রায় সকল বিট ও এর নীচের ধাপের কার্যালয়গুলোর সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম হাতে-কলমে করা হয়। সদর দপ্তরসহ প্রায় সকল কার্যালয়ে নথির স্তুপ লক্ষ করা যায়। নথিগুলো সংরক্ষণের জন্য আলাদা জায়গার প্রয়োজন পড়ে এবং রক্ষণাবেক্ষণের দরকার হয়। সকল দাপ্তরিক কাজ হাতে-কলমে করায় চাহিবামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কিছু/প্রতিবেদন প্রদান করা যায় না। এতে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে ও সরকারি অন্যান্য বিভাগের সাথে যোগাযোগে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়।[১৯০] মাঠ পর্যায়ের দাপ্তরিক হিসাব-নিকাশ কার্যক্রম প্রায় পুরোপুরি হাতে-কলমে করা হয়। বিট অফিস তাদের হিসাব-নিকাশ ম্যানুয়ালি করে রেঞ্জারের কাছে প্রেরণ করে, রেঞ্জার তা হাতে-কলমে পরখ করে। ফলে এতে ভুল থেকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।[১৯১] তবে এসব সমস্যা ও ঘাটতির বিষয়গুলো মাসিক সমন্বয় সভায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হলেও তার কোনো সমাধা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৯২]

৩.৪.৫ লজিস্টিকস ঘাটতি

অধিদপ্তরের প্রায় সকল স্তরের কার্যালয়ে লজিস্টিকস ঘাটতি বিদ্যমান। রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, স্টেশন, ফাঁড়ি ও ক্যাম্পগুলোতে প্রয়োজনীয় টেবিল চেয়ার; ফাইল রাখার জন্য ফাইল ক্যাবিনেট, আলমারি; জব্দকৃত মালামাল রাখার জন্য গোডাউন ও সেড; টহলের জন্য টর্চলাইট, চার্জার লাইট ইত্যাদির সংকট তীব্র রয়েছে।[১৯৩] সকল বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি থাকলেও রেঞ্জ কার্যালয় থেকে নিম্নস্তরের কার্যালয়গুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। দুর্গম এলাকার রেঞ্জ অফিস, স্টেশন, বিট অফিস, ফাঁড়ি ও ক্যাম্পগুলোর বিদ্যুৎ সুবিধার জন্য সৌর বিদ্যুতের প্যানেল দেওয়া হলেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট না থাকায় নিয়মিত সংস্কারের অভাবে কোনো কোনো কার্যালয়ের সৌর প্যানেল ও ব্যাটারি অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে।[১৯৪] এছাড়া বন টহল কাজে স্মার্ট পেট্রোলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা এখনো নিশ্চিত করা যায় নি।[১৯৫]

[১৮৮] তথ্যদাতা: এসিসিএফ - অর্থ, প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর।

[১৮৯] তথ্যদাতা: এসিসিএফ - অর্থ, প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর।

[১৯০] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্টার - রাঙামাটি অঞ্চল।

[১৯১] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[১৯২] তথ্যদাতা: দু'জন ফরেস্টার - রাঙামাটি অঞ্চল।

[১৯৩] তথ্যদাতা: একজন এসিসিএফ - সিসিএফ অফিস; একজন ডিএফও - চট্টগ্রাম সার্কেল; একজন বিট কর্মকর্তা-মধুপুর জাতীয় উদ্যান; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - ঢাকা বন বিভাগ; একজন বিট কর্মকর্তা - টাঙ্গাইল; একজন ফরেস্টার - শ্রীপুর রেঞ্জ।

[১৯৪] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: ফরেস্ট রেঞ্জার, কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ; চাঁদপাই রেঞ্জ - খুলনা অঞ্চল

[১৯৫] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: একজন এসিএফ, বাগেরহাট; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - ঢাকা বন বিভাগ।

৩.৪.৫.১ জুতা ও ইউনিফর্ম: মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের জন্য বছরে মাত্র এক সেট জুতা ও ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে এই এক সেট পোশাকে বছরের ৩৬৫ দিন টহল কাজ পরিচালনা করতে বনকর্মীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। বৃষ্টিতে ভিজে গেলে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে সিভিল ড্রেসে টহল দিতে হয়, সুন্দরবন এলাকার বনকর্মীদের জন্য যা ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে বছরে কমপক্ষে দু'জোড়া জামা ও জুতা প্রয়োজন।[১৯৬]

৩.৪.৫.২ দুর্গম এলাকায় টহলকাজে যোগাযোগ সমস্যা: সুন্দরবনের গভীরে গেলে নিকটবর্তী বন অফিসসহ সকলের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে বনকর্মীরা কোনো বিপদে পড়লেও কারো সহযোগিতা আশা করেও লাভ হয় না। তবে সাথে ওয়্যারলেস থাকলে নিকটবর্তী বনকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা যায়। পূর্বে সুন্দরবন এলাকার বন বিভাগের ক্যাম্প ও বিটগুলোতে ওয়্যারলেস সেট ছিল যা দিয়ে একটি ক্যাম্পের সাথে আরেকটি বা ঊর্ধ্বতন লোকদের জানানো যেতো। কিন্তু তা ওয়ারলেস সেট ও টাওয়ার নষ্ট হওয়ার পর তা মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে ওয়ারলেস সেট না দিয়ে একটি ন্যূনতম ৫-১০ কিলোমিটার রেঞ্জের ওয়াকিটকি দিলে বনকর্মীদের জন্য সুন্দরবনের মতো দুর্গম বনাঞ্চলের গভীরে টহল কাজ পরিচালনা করতে গিয়েও একেবারে বন অফিসের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সমস্যা থাকবে না।[১৯৭] সুন্দরবন এলাকায় বনকর্মীদের বন টহলকালে সহকর্মী ও পরিজনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ব্যক্তিগত মোবাইল হলো প্রধান মাধ্যম (বক্স ৬)।

বক্স ৬

"নন্দবালা টহল ফাঁড়ির (চাঁদপাই রেঞ্জ) সৌর প্যানেলের ব্যাটারি নষ্ট। প্যানেলও পুরাতন হয়ে গেছে। পাল্টানোর মতো বাজেট বরাদ্দ নেই। সূর্য না উঠলে অন্ধকারে থাকতে হয়। এমতাবস্থায় নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে মোমবাতি ও কেরোসিন কিনে অফিসে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এই ফাঁড়িতে মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না বলে বন টহলকাজে কোনো সমস্যা হলেও কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারি না। কিছুদিন পূর্বে ফাঁড়ির যে ধরে থাকতাম তা ঝড়ে ঘর উড়িয়ে নিয়ে গেলেও ঊর্ধ্বতন কাউকে কিছু জানাতে পারি নি।"- সংশ্লিষ্ট ফাঁড়ির একজন বনকর্মীর মন্তব্য।

৩.৪.৫.৩ পরিবহন ও জ্বালানি ঘাটতি

৩.৪.৫.৩.১ মোটরযান সংকট: কেন্দ্রিয় অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি কোনো পরিবহন যান নেই। কেন্দ্রিয় অফিসে বিভিন্ন ধরনের ৩০ থেকে ৩৫টি মোটরযান থাকলেও তার বেশিরভাগ পুরাতন হয়ে যাওয়ায় এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি। এছাড়া নতুন মোটরযান ক্রয়ের জন্য তিন-চার বছর পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠানো হলেও ক্রয় প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার কারণে মোটযান এখনো পাওয়া যায় নি, তবে কবে নাগাদ তা পাওয়া যাবে তাও অনিশ্চিত।[১৯৮]

৩.৪.৫.৩.২ টহলযান স্বল্পতা: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে ন্যূনতম সংখ্যাক মোটরযান ও নৌযান নেই। আর কিছু থাকলেও তা পুরাতন আমলের এবং প্রায়শ অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। যেসব কার্যালয়ে টহলের জন্য সামান্য যানবাহন আছে তা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাবে অচল হয়ে পড়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজ খরচে মেরামত করে ও জ্বালানি কিনে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এমতাবস্থায়, স্থানীয় কাঠচোর/ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আইন-বহির্ভূতভাবে অর্থ ও টহলযান নিয়ে বনকর্মীগণ ক্ষেত্র বিশেষে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হওয়ার তথ্য রয়েছে। কাঠচোর, কাঠ ব্যবসায়ী, জেলে ও মধু সংগ্রহকারীদের নিকট হতে টাকা নিয়ে টহলযানের তৈল কেনার অভিযোগ রয়েছে।[১৯৯]এছাড়া সুন্দরবনের বন প্রহরীদের বন টহল কাজের জন্য সবচেয়ে জরুরি বাহন হলো ইঞ্জিনবোট। কিন্তু তাদের কাছে পর্যাপ্ত বোট থাকে না। কোনো কোনো বিটে নৌকা থাকলেও তা চালানোর মতো জ্বালানি তাদের থাকে না। সুন্দরবন এলাকায় বন টহল কাজে মূলত ইঞ্জিনচালিত ছোট কাঠের ব্যবহার করতে হয়, যা লোনা পানির জন্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এই টহলযান সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলের জন্য অনুপযোগী। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত স্পিডবোট না থাকায় পুরাতন ও স্বল্পগতির ইঞ্জিন নৌকা দিয়ে জলদস্যু দলগুলোর দ্রুতগতিসম্পন্ন ও আধুনিক ইঞ্জিনচালিত ট্রলারগুলোকে তারা ধরতে পারে না। এমতাবস্থায় বনকর্মীরা চাইলেও বন অপরাধীদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আটক করতে পারে না।[২০০]

গবেষণায় দেখা যায়, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে মোটরযান, মোটরসাইকেল, ইঞ্জিন নৌকা, স্পিড বোট, সাইকেল, ইত্যাদি স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন সময় ভাড়া করা মোটরযানে টহল দিতে হয়। আর এসব খরচ নিজেকে বহন করতে হয়। যানবাহনের স্বল্পতা ও জ্বালানি তেলের অভাবে টহল কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। এতে বনজ সম্পদ ও বন বেদখল হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।[২০১] জরিপ বা সেম্পল প্লট সার্ভের জন্য প্রতিমাসে বিভিন্ন টিম সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে যাচ্ছে। তাদের যাতায়াতের জন্য আধুনিক জলযানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায়, দুর্ঘটনায় পড়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে একটি সাধারণ ইঞ্জিন বোটে ২০ থেকে ২৫ বনকর্মীকে যাতায়াত করতে

[১৯৬] তথ্যদাতা: চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকায় কর্মরত একজন বনপ্রহরী।

[১৯৭] প্রাগুপ্ত।

[১৯৮] তথ্যদাতা: বন অধিদপ্তরের একজন সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক।

[১৯৯] তথ্যদাতা: গণমাধ্যম কর্মী।

[২০০] প্রাগুপ্ত।

[২০১] তথ্যদাতা: বন অধিদপ্তরের একজন সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক।

হয়। কখনো কখনো দুর্ঘটনায় পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে লঞ্চ নিয়ে বনে যেতে হয়। তখন লঞ্চের তেলের খরচ বনকর্মীদের বহন করতে হয়।[২০২] সরকারি বনের দুর্গম এলাকায় বিশেষ করে সুন্দরবন ও পার্বত্য অঞ্চলে আধুনিক ও দ্রুত গতির টহল যান ও পর্যাপ্ত জ্বালানির অভাবে বন টহল কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া বনদস্যুদের আধুনিক ও দ্রুত গতির ট্রলারযানকে বন বিভাগের এই ছোট ইঞ্জিন নৌকা দিয়ে তাড়া করা যায় না বলে বনকর্মীদের অভিমত।[২০৩]

৩.৪.৫.৪ নিরাপত্তা সরঞ্জামের ঘাটতি

গবেষণায় পর্যবেক্ষণে বন রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ের বন কার্যালয়গুলোতে বন প্রহরীদের জন্য আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম, যেমন- বন্দুক, কার্তুজ, ইত্যাদির ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। খুলনা অঞ্চলের কিছু কার্যালয়ে নিরাপাত্তা সরঞ্জাম থাকলেও সকল কার্যালয়ে তা দেওয়া হয় নি। এমতাবস্থায় বনকর্মীদের একাংশকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলদস্যুপ্রবণ সুন্দরবনের ভেতর পেট্রোলিং এর কাজ করতে হয়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে সরকারের নির্দেশে 'কেন্দ্রীয় অঞ্চলের'[২০৪] বন অফিসগুলো থেকে বন টহলকাজে ব্যবহার করা সকল আগ্নেয়াস্ত্র প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়ার পর আর ফেরৎ দেওয়া হয় নি। তবে মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে বিট, ফাঁড়ি ও ক্যাম্পগুলোতে অস্ত্র সংরক্ষণ করার মতো প্রয়োজনীয় জনবল ও সংরক্ষণাগারের ঘাটতি প্রকট। একজন বন কর্মকর্তার মতে, বনকর্মীদের কাছে থাকা রাইফেল পুরানো ধাচের এবং তা জরাজীর্ণ ও অকেজে থাকার বিষয়টা বন অপরাধীদের জানা থাকায় তারা বন প্রহরীদের ভয় পায় না।[২০৫] উল্লেখ্য, সুন্দরবন ও পার্বত্য অঞ্চলে বনদস্যুদের আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, অপরদিকে, বনকর্মীদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পুরাতন, জরাজীর্ণ ও অকেজো চাইনিজ রাইফেল থাকে যা দিয়ে তাই প্রহরীরা চাইলেও এদের প্রতিরোধ করতে পারে না (বক্স ৭)।

বক্স ৭

"আগ্নেয়াস্ত্র নষ্ট কিংবা অকেজো হলে, জেলা প্রশাককের কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশের কাছে ঠিক করার জন্য জমা দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বেশি পুরাতন ও জরাজীর্ণ হওয়ায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। ব্যবহার অনুপযোগী আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে আমরা বন পাহারা দেই যাতে অন্তত ছিঁচকে গাছচোররা আমাদেরকে দেখে কিছুটা সতর্ক থাকে।"- একজন বন প্রহরীর মন্তব্য

৩.৪.৬ বনকর্মীদের নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি

৩.৪.৬.১ টহলকাজে বাধা: বনকর্মীদের ভাষ্যমতে, পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন সশস্ত্রদলগুলোর বাধার মুখে বনকর্মীরা চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংরক্ষিত বনের সব স্থানে তথা দুর্গম এলাকায় টহল কাজ পরিচালনা করতে পারে না। এমতাবস্থায়, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান বন বিভাগের অধীন অধিকাংশ রেঞ্জ, বিট ও টহলক্যাম্পের কার্যালয়গুলোর কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দুর্গম অঞ্চলের কার্যালয় থেকে প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট জেলা শহরে এনে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কার্যালয় কিংবা উক্ত বন কার্যালয়ের নিকটবর্তী সরকারি কোনো পরিত্যক্ত ভবন সংস্কার করে কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩.৪.৬.২ নিরাপত্তাহীনতা: মাঠ পর্যায়ে বনকর্মীদের নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে হয়। অবৈধভাবে কাটা গাছ উদ্ধার ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে স্থানীয়দের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে ক্ষেত্র বিশেষে সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বনকর্মীদের স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে আপোষ করে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও নির্দেশনা থাকে। বনকর্মীদের একাংশ সাহস করে পার্বত্য এলাকার দুর্গম অঞ্চলে টহলে চায় না। নিরাপত্তাহীনতার কারণে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন সশস্ত্রদলগুলোর বাধার মুখে বনকর্মীরা চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংরক্ষিত বনের সবস্থানে তথা দুর্গম এলাকায় টহল কাজ পরিচালনা করতে পারে না। নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান বন বিভাগের অধীন অধিকাংশ রেঞ্জ, বিট ও টহল ক্যাম্পের কার্যালয়গুলোর কর্মীদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলো হতে সরিয়ে এনে তিনটি পার্বত্য জেলা শহরে বসে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে (বক্স ৮)।

বক্স ৮

"আমাদের ফাঁড়িতে (চাঁদপাই রেঞ্জের জোংড়া টহল ফাঁড়ি) মাত্র দু'টি চাইনিজ বন্ধুক আছে যা আমরা চারজন বন প্রহরী সুন্দরবনের ভেতরে পালাক্রমে ব্যবহার করি। এই ক্যাম্পে কমপক্ষে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োজন। দু'টি দল টহলে গেলে প্রতিটি দলের সাথে একটা আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। ফলে আমাদের মনে সবসময় একটা শঙ্কা কাজ করে।"- একজন বন প্রহরীর মন্তব্য (চাঁদপাই রেঞ্জ)।

[২০২] তথ্যদাতা: বিভাগীয় পর্যায়ের একজন বন কর্মকর্তা।

[২০৩] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার।

[২০৪] ঢাকা, টাঙ্গাইল - ময়মনসিংহ ও সিলেট বন বিভাগ।

[২০৫] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার - ঢাকা বন বিভাগ; একজন ফরেস্ট রেঞ্জার ও একজন বিট অফিসার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

৩.৪.৬.৩ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়া: প্রাপ্ত তথ্যমতে, চট্টগ্রাম সার্কেলের পার্বত্য অঞ্চল ও কক্সবাজার এলাকায় বনকর্মীদের টহল কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপহরণের স্বীকার হতে হয়। কক্সবাজার শহর সংলগ্ন ইনানী বিটে জবর দখল আটকাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বনকর্মী হামলার শিকার হন। এরপর মামলা করতে গিয়ে রাজনৈতিভাবে হুমকির পাওয়ায় মামলা করা হয় নি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত হওয়ার পরও অফিস হতে কোনো চিকিৎসা খরচ পাওয়া যায় নি।[২০৬] চট্টগ্রাম সার্কেলের পার্বত্য অঞ্চল ও কক্সবাজার এলাকায় বনকর্মীদের টহল কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়াসহ অপহরণের শিকার হতে হয়। কক্সবাজার শহর সংলগ্ন ইনানী বিটে জবর দখল আটকাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বনকর্মী শারীরিকভাবে হামলার শিকার হন। এরপর মামলা করতে গিয়ে রাজনৈতিভাবে হুমকি পাওয়ায় মামলা করা হয় নি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত হওয়ার পরও অফিস হতে কোনো চিকিৎসা খরচ পাওয়া যায় নি। একজন বিট কর্মকর্তা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের নিকট অবৈধ দখলে থাকা সরকারি বনের জমি উদ্ধারে গেলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোন করে হাত কেটে নেওয়াসহ দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[২০৭]

বক্স ৯

"আমরা বনকর্মীরা সার্বক্ষণিক টেনশনে থাকি। যে বনকর্মী সকল মানুষকে ম্যানেজ করে চলতে পারেন তাদের প্রতি ডিএফও সন্তুষ্ট থাকেন। এতে সরকারি বনের গাছ চুরি কিংবা জমি বেদখলের ঘটনা ঘটলেও ডিএফও এর কিছু আসে যায় না। এমতাবস্থায় আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বন দখলকারী ও গাছচোর, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের নিজ বুদ্ধি ও কৌশলবলে ম্যানেজ করে এক-একটি দিন পার করে চাকরি রক্ষা করা, বন নয়। - একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য (টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

৩.৪.৭ সরকারি বন ও বনজ সম্পদ রক্ষায় চ্যালেঞ্জ

৩.৪.৭.১ বাইরের চাপ

৩.৪.৭.১.১ জমির চাহিদা বৃদ্ধি ও সরকারি বনের জমির ওপর চাপ সৃষ্টি: গাজীপুর, কালিয়াকৈর, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর অঞ্চল শিল্পাঞ্চল হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ আবাসন দরকার হয়, যা এসকল এলাকায় অপ্রতুল। শিল্প স্থাপনের জন্য যেমন বনের জমি দখল করা হচ্ছে, তেমনি শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের আবাসনের জন্যও বনের জায়গা দখল করা হচ্ছে। ফলে এক শ্রেণীর অসাদুপায়ী স্থানীয় ব্যক্তি বনভূমির জায়গায় শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের আবাসনের বাড়িঘর তুলে ভাড়া দিচ্ছে। এসকল দখলকারী ব্যক্তিদেরও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং এরা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে এদের উচ্ছেদ করা অনেক দূরুহ ব্যাপার।[২০৮]

৩.৪.৭.১.২ রাজনৈতিক চাপ: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে বন বিভাগে যারা চাকরি করেন তারা কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের চেয়ে বেশি রাজনৈতিক চাপের মুখে থাকেন, কারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ বন অধিদপ্তরের জমি দখল ও বিক্রি করেন অথবা সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বনভূমি দখলকারী ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়। অবৈধ দখলকারী উচ্ছেদের সময় সরকার ও অন্যান্য সংস্থা থেকে বিভিন্ন ধরনের চাপ দেওয়া হয়। জবরদখলকারী প্রায় সকলের রাজনৈতিক পরিচয় থাকে।[২০৯] কোনো গাছচোর বা বনের কোনো সম্পদ ধ্বংসকারীকে আটক করলে, রাজনৈতিক চাপ আসে ও হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বনকর্মীদেরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার উদাহরণ রয়েছে।[২১০] উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের একাংশের অভিপ্রায় ও নির্দেশ মোতাবেক অবৈধ কাজে সহাযোগিতা না করায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হওয়ার উদাহরণ আছে।[২১১]

বক্স ১০

"খুলনার তৎকালীন একজন সংসদ সদস্য আমাকে (প্রধান বন সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে) ফোন করে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের কিছু জমি পার্কের নকশা থেকে বাদ দিতে বললেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন এই জমি তার এক আত্মীয়ের। এই জমি অবশ্যই নকশা থেকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে তিনি দেখে নিবেন। তবে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধুর সাফারি পার্কের জায়গাটি ছিল রিজার্ভ ফরেস্ট। সেখানে ব্যক্তি মালিকানার জমি থাকে কী করে? আরো কয়েকবার ফোন দিয়ে হুমকি ধমকি দিয়েছেন একই সংসদ সদস্য। একবার ওনার আত্মীয়কে জমির কাগজপত্রসহ আমার অফিসে আসতে অনুরোধ জানাই। এমপি'র আত্মীয় যে দলিল ও কাগজপত্র নিয়ে আসেন তা ছিল নকল। উক্ত ব্যক্তি রিজার্ভ ফরেস্টের জমি কী কারণে যাচাই না করে স্থানীয় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার কাছ ক্রয় করলেন তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেন

[২০৬] তথ্যদাতা: একজন বিট অফিসার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[২০৭] প্রাগুপ্ত।

[২০৮] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও, কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[২০৯] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[২১০] তথ্যদাতা: একজন বনপ্রহরী - চাঁদপাই রেঞ্জ।

[২১১] তথ্যদাতা: একজন প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক।

নি। এমতাবস্থায় বন বিভাগের কিছু করণীয় নেই বলে তাকে জানালে ঐ ব্যক্তিও আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এর মধ্যে জানা যায়, উক্ত সংসদ সদস্য, তার আত্মীয় ও স্থানীয় ক্ষমতাসীন দল সমর্থক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা- এই তিনজন মিলে বন বিভাগের জমিতে একটি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে সাফারি পার্ক নির্মাণ শুরু করাতে বন বিভাগের জমি আর বেদখল করতে পারে নি।"- একজন প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য

"১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে দেশের একটি শীর্ষ পর্যায়ের ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপ গাজীপুরের শফিপুর মৌজায় প্রায় ৪.৫৩ একর সরকারি বনভূমির জমি দখল করে। বন অধিদপ্তর সরকারি গজারি বনের জমি বেদখল দেখিয়ে পাঁচটি মামলা করলেও উক্ত ব্যবসায়ী গ্রুপ তা তোয়াক্কা না করে দখলকৃত বনের জমিতে পাঁচটি শিল্প কারখানা তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ইতোমধ্যে সেখানে মোট ছয়টি শিল্প কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি নিকটবর্তী সরকারি গজারী বনের আরো জমি দখলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষক থাকাকালে স্থানীয় জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় নিয়ে উক্ত গ্রুপের দখলে থাকা বনের জমি উদ্ধারে পদক্ষেপ নিলে গ্রুপটির মালিকানাধীন একটি সংবাদপত্র ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক (অনিয়ম ও দুর্নীতি) সংবাদ প্রকাশ ও প্রকাশ করতে থাকে। সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে উক্ত গ্রুপের এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ ও বেদখলও হওয়া বনের জমি উদ্ধারে সহায়তার অনুরোধ করেও সহায়তা পাওয়া যায় নি। এমতাবস্থায় সরকারের কোনো পর্যায় থেকে কোনো প্রকার সহায়তা না পেয়ে আমরা হাল ছেড়ে দিই।"- একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তার মন্তব্য

উপরের দু'টো কেইস স্টাডি থেকে দেখা যায়, সরকারি বন ও বনভূমির জমি অবৈধভাবে দখল করা ও তা বজায় রাখার জন্য সশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী গ্রুপ তাদের অর্থনৈতিক শক্তি, ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কাজে লাগায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বে দখলকারী ব্যক্তি সরকারি দলের রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ায় বন বিভাগ থেকে ব্যবস্থা নেওয়াটা কঠিন হয়।[২১২] একজন বন কর্মকর্তার মতে, রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ জনমঞ্চের বক্তৃতায় সরকারি বন রক্ষার পক্ষে জোড়ালো ভাষণ দিলেও নিজে কিংবা নিজের লোক দিয়ে বনের জমি অবৈধভাবে দখল করেন।

৩.৪.৭.১.৩ বনের জমি চিহ্নিতকরণ না হওয়া: সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের জমির সীমানা নির্দিষ্ট করা না থাকায় শুধু গাছ ও বাগান আছে এমন জায়গায় বনকর্মীরা সাধারণত টহল দিয়ে থাকে।[২১৩] সরকারি বনের জমি বেদখল হওয়ার জন্য বনের সীমানা চিহ্নিত না হওয়া অন্যতম সহায়ক বলে বনকর্মীদের অভিমত।

বক্স ১১

"আমি যে রেঞ্জ এলাকায় কর্মরত তার সীমানা চিহ্নিত করা হয় নি। তাই বনকর্মী হয়ে আমি নিজেই সরকারি বনের জমির সীমানা সম্পর্কে জানি না। সীমানা চিহ্নিত করা গেলে গাছশুন্য জায়গায় বনায়ন করতে পারতাম। এছাড়া বনের জমিতে অবৈধ স্থাপনা স্থাপনের শুরুতে তা উচ্ছেদে পদক্ষেপ নিতে পারতাম। তাই সরকারি বন ও বনের জমি রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বনের সীমানা চিহ্নিত করে জনসাধারণকে তা জানিয়ে দেওয়ার মতো চিহ্ন স্থাপন।"- একজন ফরেস্টারের মন্তব্য (কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ)

৩.৪.৭.১.৪ নিরবিচ্ছিন্ন বনের অনুপস্থিতি: দেশের অধিকাংশ সংরক্ষিত বন সুন্দরবনের মতো নিরবিচ্ছিন্ন নয়। এই বনের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি মালিকানাধীন বন ও জমি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সংরক্ষিত বনগুলোর ভেতরে সাধারণ মানুষের বা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ও বন থাকায় সংরক্ষিত বনের বনজ সম্পদ ও বনের জমি বেদখল করার সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা বন বিভাগের সংরক্ষিত বনের অধীনে থাকা ফরেস্ট রেঞ্জগুলোতে বিশেষ করে শ্রীপুর, কালিয়াকৈর ও রাজেন্দ্রপুর, ইত্যাদির মধ্যে স্থানীয়দের বাড়ি-ঘর, চাষের জমি এবং ব্যক্তিগত জোত রয়েছে। আশেপাশে বসবাস করা স্থানীয়রা তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য অনেকাংশে বনের ওপর নির্ভরশীল। কখনো কখনো জ্বালানি কাঠের জন্য স্থানীয়রা সরকারি শালবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। আবার শিল্পের ধোয়া ও বর্জ্যের কারণেও গাছ মরে যায়। ফলে শালবনের প্রাকৃতিক বিস্তার ব্যাপকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।[২১৪]

কৃষি কাজ ও শিল্প কারখানায় বেশি লাভবান বলে ব্যক্তি মালিকানাধীনরা বনের গাছ কেটে ফেলে। বনের মাঝখানের একটি অংশ গাছ কেটে সাফ করা হলে এর প্রভাব আশে-পাশের বনেও পড়ে। আবার অনেকে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির সাথে সাথে বনের জমি দখল করে চাষাবাদ শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিগুলো শিল্প-কারখানার মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। শিল্প মালিকরা প্রথমে ক্রয়কৃত জমিতে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে। এরপর এসব স্থানে যাতায়াতের জন্য সরকারি বনের গাছ কেটে রাস্তা তৈরি করে। কারখানার পরিসর বড় করার জন্য ক্রয়কৃত জমির পার্শ্ববর্তী সরকারি বন ক্রমশ দখল করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ও স্থাপনায় যাতায়াতের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মালিকরা সাধারণত সরকারি বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে। এক্ষেত্রে বন আইনে মামলা দায়ের করা হলেও প্রভাবশালীদের সাথে বন বিভাগ কুলিয়ে ওঠতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে সরকারি বন রক্ষার লক্ষ্যে সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে বন

[২১২] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

[২১৩] তথ্যদাতা: একজন বিট রেঞ্জ কর্মকর্তা - রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

[২১৪] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও - কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

অধিদপ্তর সুপারিশ করলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকার সংরক্ষিত বনের ভেতরে থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি, জনবসতি ইত্যাদি অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দ্বারা সকল সংরক্ষিত বন নিরবিচ্ছিন্ন সংরক্ষিত বনে রূপান্তর করলে সরকারি বন উজাড় ও বেদখল করার সুযোগ কমতো। এতে করে নিবিড় বন করার সুযোগ তৈরি হতো, কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত না করায় শালবন বিলুপ্তির পথ ত্বরান্বিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, আশির দশকে গাজীপুর এলাকায় শালবনের আয়তন ছিল প্রায় দশ হাজার একর, যা বর্তমানে ৭০০ থেকে ৮০০ একরে এসে ঠেকেছে। বর্তমানে গাজীপুরের বন প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।[২১৫]

৩.৪.৭.১.৫ অপরিকল্পিতভাবে বনসৃজন: মূলত একটি পাহাড় টিকবে কিনা না টিকবে সেটি নির্ভর করে এর উপর কোন গাছগুলো রয়েছে বা কোন গাছের চাষ করা হচ্ছে। সাধারণত তিনটি স্তরে গাছ লাগাতে হয় এবং স্তর অনুযায়ী গাছের ধরনও নির্ভর করে। পাহাড়ের নীচু অংশে চাপালিশ, মেহগনি ও গর্জন, মাঝামাঝি সেগুণ গাছ লাগানো নিয়ম থাকলেও পার্বত্য এলাকায় অধিক লাভের আশায় পুরো পাহাড়জুড়ে সেগুণ লাগানোর দিকে মানুষের আগ্রহ বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। পাহাড় ধ্বসের জন্য এটা অন্যতম কারণ। তবে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় পরিকল্পিত, পরিবেশ-বান্ধব বনায়নে স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অনুপস্থিত।

৩.৪.৭.১.৬ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দ্বারা বন ও জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট: নামে সামাজিক বন হলেও বাস্তবে এই বন কোনো প্রকারে সামাজিক নয়। এই বন সৃষ্টি করতে গিয়ে বিদ্যমান বনে বহুধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করতে হয়। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়নের আওতায় আকাশমনি ও ইউকেলিপটাস জাতীয় গাছ রোপন করার লক্ষ্যে সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের অবশিষ্ট গাছ, গাছের গোড়া যা থেকে নতুন গাছ জন্মায়, চারাগাছসহ ছোট-বড় সকল গাছ ও লতাগুল্ম পুরোপুরি কেটে ও উপড়ে ফেলা হয়। সংরক্ষিত বনের স্থলে যে বন সৃষ্টি করা হয় তা বিদ্যমান বহুপ্রজাতির গাছগাছালি ও লতাগুল্মের স্থলে মাত্র একটি বা দু'টি প্রজাতির গাছের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয়।

৩.৪.৭.১.৭ নিয়ন্ত্রণহীন জুম চাষ: তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয়দের ঝুম চাষের ওপর বন অধিদপ্তরের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ও অকল্পিতভাবে পাহাড়ের গাছপালা কেটে ঝুম চাষের প্রসার অব্যাহত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[২১৬] জুমের জমি সম্প্রসারণ ও আগাছা পরিষ্কার করার লক্ষ্যে জুম চাষীদের একাংশ কর্তৃক প্রথমে সরকারি বনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে বনের ছোট বড় সব গাছ পুড়ে যায়। এরপর পুড়ে যাওয়া গাছ চুরি করে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত জুম চাষ দ্বারা স্থানীয় প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যও ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিবিরোধসহ সশস্ত্র বিভিন্ন দলের সক্রিয়া অবস্থান থাকায় জুম চাষীদের এসব কর্মকাণ্ডে বনকর্মীরা বাধা সৃষ্টি করতে সাহস পান না বলে অভিমত রয়েছে।[২১৭]

৩.৪.৭.১.৮ রোহিঙ্গাদের জন্য সৃষ্ট ঝুঁকি: ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে গিয়ে বন বিভাগের প্রায় সাত হাজার একর বন বেদখল ও এক হাজার ৯৩৪ একর বনভূমির গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের নিকটবর্তী বনের গাছ প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাটা অব্যাহত আছে।

৩.৪.৭.১.৯ পার্বত্য অঞ্চলের সংঘাত: গবেষণায় প্রাপ্ত মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সশস্ত্রবাহিনীগুলোর বাধার ও স্থানীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিবদগুলো, অনীহার মুখে বন বিভাগ কার্যত কোনো প্রকল্প নিতে পারছে কিংবা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর মূলে রয়েছে স্থানীয় ভূমি-বিরোধ। একজন ডিএফও এর মতে, পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত কোনো স্থানীয় সংগঠনগুরো বন বিভাগকে কাজ করতে দিতে রাজী নয়।"[২১৮]এমতাবস্থায় তিনটি পার্বত্য জেলায় বন বিভাগের কর্মকাণ্ড মূলত জেলাশহর ভিত্তিক। নিরাপত্তাহীনতার জন্য অধিকাংশ রেঞ্জ ও বন অফিসের মাঠ পর্যায়ের দাপ্তরিক কাজ শান্তিচুক্তির পর হতে জেলা শহর হতে পরিচালনা করা হয়। এতে করে মাঠ পর্যাযের বন সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবে বন বিভাগের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই। এসব স্থানের মূল নিয়ন্ত্রক হলো স্থানীয় সশস্ত্রদলগুলো। প্রাপ্ত তথ্যমতে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি সংরক্ষিত বনের গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে বলে বনকর্মীদের অভিমত।[২১৯]

বক্স ১২

"পার্বত্য অঞ্চলে নিরাপত্তা ঝুঁকি একটা অযুহাত মাত্র। বন বিভাগ চাইলে স্থানীয় পাহাড়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণকে বুঝিয়ে বনায়ন ও বন সংরক্ষণের কাজ জেলা সদরের বাইরে অবস্থান করেও করতে পারে। নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়টি বনের কর্মীরা কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে।"- জাতীয় পর্যায়ের একটি দৈনিকের বান্দরবান জেলাস্থ প্রতিনিধি

[২১৫] প্রাগুপ্ত।

[২১৬] একজন বিট ফরেস্ট রেঞ্জার - রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

[২১৭] প্রাগুপ্ত।

[২১৮] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও, রাঙ্গামাটি অঞ্চল; একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জুম নিয়ন্ত্রণ বন বিভাগ, রাঙামাটি।

[২১৯] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও, রাঙ্গামাটি অঞ্চল; একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জুম নিয়ন্ত্রণ বন বিভাগ, রাঙামাটি।

৩.৪.৭.১.১০ বনের মধ্য দিয়ে সড়ক নির্মাণ ও তা প্রশস্তকরণ: সরকারি বনের ভেতর দিয়ে সড়ক নির্মাণ ও প্রশস্তকরণের পর সড়কের উভয় পাশের জমির চাহিদা বেড়ে যায়। এর পাশাপাশি সরকারি বন অবৈধভাবে দখলের ঘটনাও বৃদ্ধি পায়।

৩.৪.৭.১.১১ বনজসম্পদ চুরি ও পাচাররোধে কার্যকর পদক্ষেপ অনুপস্থিত: স্থানীয় জনগণ ও বনজ সম্পদ চুরির অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা ছিল তাদেরকে সম্পৃক্ত করে বন রক্ষার জন্য ২০১০ সালে একটা প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। এ প্রজেক্টের অধীন প্রায় ৭০০ জন কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার (সিএফডব্লিউ) নিয়োগ দেওয়া হয়। এদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়ে বন রক্ষার কাজে নামানো হয়। সাপ্তাহিক ভাতা ও অন্যান্য অনুসঙ্গ সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পটি তিনবছর চলার পর বাজেটের অভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হলে সিএফডব্লিউ এর সদস্যদের একাংশ পুনরায় বনজ সম্পদ চুরিতে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২২০]

৩.৪.৭.১.১২ বন্যপ্রাণী আটক, জব্দ, উদ্ধার ও সংরক্ষণে বাধা: বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ এখন গুপ্তশিকারি ও চোরাকারবারীদের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিযায়ী পাখিরা শতভাগ নিরাপদ নয়। বিভিন্ন স্থানে এখনো এই ধরনের বিদেশী পাখি ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের টোপ ব্যবহার করা হয়। উদ্ধার ও জব্দকৃত বন্যপ্রাণীদের কেন্দ্রীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ উত্তরায় একটি শেল্টার খোলা হয়েছে। একটি বিল্ডিং-এর কয়েকটি রুম নিয়ে একটি শেল্টার করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এটিতে গাদাগাদি করে কিছু বন্যপ্রাণীকে রাখা হয়েছে- যা কোনো অর্থেই সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ বলা যায় না বল একজন বন কর্মকর্তার অভিমত।[২২১] এছাড়া বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার জন্য দেশের সাতটি বিভাগে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা কেন্দ্র করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা করা নি।[২২২] গবেষণায় দেখা যায়, একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতে গেলে অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যেমন- প্রথমে প্রাণীটিকে চিহ্নিত করতে হয়, এরপর উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরে জানাতে হয়, তখন কাঠ কয়লা তেল খরচ করে আমাদেরকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। এভাবে সাত-আট দিন সময় লাগে তাদের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন করতে। এসব ক্ষেত্রে প্রাণীদেহের কোনো অঙ্গ খুঁজে পাওয়া না গেলে ক্ষেত্র বিশেষে উল্টো উদ্ধারকারীর ওপর দায় চাপানো হয়। তখন এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা ব্যয় করতে হয়। জীবিত প্রাণী আটক করলে তার চিকিৎসা খরচ নিজের পকেট থেকে দিতে হয়। একটি হরিণ উদ্ধার ও তার চিকিৎসা শেষে বনে ছেড়ে দেওয়া জন্য ১০-১২ হাজার টাকা নিজের পকেট হতে খরচ করতে হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা রেঞ্জ অফিস থেকে পাওয়া গেলেও তা পেতে কয়েক মাস লেগে যায়। এমতাবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে বনকর্মীরা বন্যপ্রাণী আটক কিংবা উদ্ধারে উৎসাহী হন না।[২২৩]

৩.৪.৭.১.১৩আটক ও উদ্ধারকৃত গাছ ও বনজ দ্রব্য সংরক্ষণ ও বিক্রিতে চ্যালেঞ্জ: সরকারি ক্রয়-বিক্রয় আইন মেনে আটককৃত গাছ ও কাঠ বিক্রি করতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়।[২২৪] বন মামলা ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত (প্রায় চার-পাঁচ বছর) আটককৃত মালামাল (মালিকানা দাবিদার রয়েছে এমন কেস) স্থানীয় বন কার্যালয় প্রাঙ্গণে ও হেফাজতে রাখতে হয়। স্থানীয় বন অফিসে জব্দকৃত কাঠ বা গাছ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তা খোলা আকাশের নিচে রাখতে হয়। এমতাবস্থায় খোলা আকাশের নীচে রাখায় এসব মালামাল রোদের তাপে ও বৃষ্টির পানিতে গাছ ও কাঠের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে তা জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। তবে মামলা শেষ হওয়ার সাথে-সাথে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। তবে সংরক্ষাণাগারের অভাবে আটকৃত গাছের মান নষ্ট হয়ে গেলে বারবার করেও ক্ষেত্র বিশেষে দরপ্রস্তাব পাওয়া যায় না।[২২৫] মামলা দায়েরের সময় ৩৫ আটককৃত গাছ বা কাঠের দাম কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা হলেও পাঁচ বছর পর ৩৫ হাজার টাকা মূল্যমানের সর্বোচ্চ দরপ্রস্তাব পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এমতাবস্থায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করলে বনকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকারি অডিট আপত্তিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট হতে শো'কজ নোটিশ জারির তথ্য রয়েছে।[২২৬]

৩.৪.৭.১.১৪ বন অধিদপ্তরের আপত্তি উপেক্ষা করে গাছ কেট সড়ক নির্মাণ: কক্সবাজারের হিমছড়ি এলাকায় পাহাড় ও গাছ কেটে মেরিন ড্রাইভ সড়ক তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো আশানুরুপ ফল পাওয়া যায় নি।[২২৭]

৩.৪.৭.১.১৫ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের একাংশের চাপ: বনের জমি অবৈধভাবে দলকারী প্রভাবশালীদের একাংশের মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল থাকায় এসব গণমাধ্যম দখলস্বত্ব টিকিয়ে রাখার বন বিভাগের স্থানীয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণায় ব্যবহার করার উদাহরণ রয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের একাংশ প্রভাবশালীদের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা নিয়ে

[২২০] তথ্যদাতা: জাতীয় পর্যায়ের একটি সংবাদ পত্রের সাংবাদিক।

[২২১] তথ্যদাতা: একজন সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক - সদর দপ্তর।

[২২২] তথ্যদাতা: একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[২২৩] তথ্যদাতা: একজন বিট অফিসার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[২২৪] তবে ইউডিআর কেসের ক্ষেত্রে কেউ দাবিদার না থাকলে আটকের এক মাসের মধ্যে বন বিভাগ গাছ বা কাঠ বিক্রি করতে পারে।

[২২৫] তথ্যদাতা: একজন সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক - সদর দপ্তর।

[২২৬] তথ্যদাতা: একজন সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক - সদর দপ্তর।

[২২৭] তথ্যদাতা: একজন এসিএফ, চট্টগ্রাম অঞ্চল।

কিংবা অবৈধ সুবিধা নিতে, যেমন- সুন্দরবন এলাকায় হরিণ মারার সুযোগ দেওয়া স্থানীয় বনকর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে।[২২৮]

৩.৪.৭.২ অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

বনের জমি জবরদখল ঠেকাতে বাধা দিতে গেলে রেঞ্জ ও বিট কর্মকর্তার ওপর অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক চাপ আসে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, যেসব বনকর্মী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মর্জিমাফিক মাঠ পর্যায়ের বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাধা মোকাবেলা করে তারা মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বে টিকে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে বনের জমি বেদখল বা গাছ চুরি হলেও কারো কিছু আসে যায় না। অন্যথায়, বনকর্মীদের রেঞ্জ ও ডিএফওদের বিরাগভাজন হতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[২২৯]

বক্স ১৩

"বন ও বনজ সম্পদ রক্ষায় বিট পর্যায়ে কর্মীদের একাংশের সদিচ্ছা থাকলেও রেঞ্জ ও ডিএফও হতে ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ণ সমর্থন বা সহায়তা পাওয়া যায় না। উর্ধ্বতন কর্তাদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে অর্পিত দায়িত্ব সৎভাবে সম্পাদন করতে গেলে শাস্তিমূলক বদলির শিকার হতে হয়।"[২৩০]- একজন ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তার (টাঙ্গাইল বন বিভাগ) মন্তব্য

২.৩.১৪ স্বচ্ছতাজনিত চ্যালেঞ্জ

সার্বিকভাবে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিরাজমান, যেমন- সংরক্ষিত বনভূমির জমি বৃহৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহারের অনুমতি/ সম্মতি প্রদান সম্পর্কিত বন অধিদপ্তরের অবস্থান ও মতামত সংক্রান্ত নথি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয় না; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দেওয়া ও জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণের ওপর মাঠ জরিপভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নেই; ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত; প্রতিবছর বনভূমির কী পরিমাণ জমি জবরদখল হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ না করা হয় না; রেঞ্জ, বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি, ক্যাম্প, ইত্যাদি কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করা নেই; প্রধান বন সংরক্ষক, বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের ওপর নাগরিক সনদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও এসবে বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম উল্লেখ করা নেই; প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অভিযোগ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর প্রদর্শন করা হয় না। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনায় ক্রয় পদ্ধতির ধরণ উল্লেখ না থাকা- দুর্নীতির ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মীদের পদোন্নতি, বদলিসহ ও প্রকল্প পরিচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন দ্বারা নিয়োগ প্রক্রিয়া বনকর্মীদের নিকট অস্পষ্ট। এছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

৩.৪.৮ বনকর্মীদের জবাবদিহির ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ

৩.৪.৮.১ তদারকিতে ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি

মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হয়। রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ে কোথায় কী হচ্ছে তা ডিএফও নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে শুধু অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ডিএফও কর্তৃক তা আমলে নেওয়ার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সকল কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত। বর্তমানে শুধু প্ল্যান্টেশন/সৃজিত বাগান সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যতদিন অর্থ বরাদ্দ থাকে) পরিবীক্ষণ করা হয়, কিন্তু অন্য কোনো কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সরাসরি তদারকি করা হয় না। ফলে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় প্রকল্পের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা থেকে প্রায়শ বাদ পড়ে যায়। অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনে পারস্পরিক যোগসাজশে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না করার সুযোগ রয়েছে, যেমন- একটি বিট এলাকায় বন সৃজন প্রকল্পের বনায়ন কাজ এক তৃতীয়াংশও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না হলেও জরিপ প্রতিবেদনে ৮০ শতাংশ অধিক হয়েছে- এই মর্মে উল্লেখ করার সুযোগ বিদ্যমান। এছাড়া বিদ্যমান ব্যবস্থায় মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের বেতন-ভাতা ও প্রকল্পের অর্থ মূলত ডিএফও ও রেঞ্জ কর্মকর্তা উভয়ে মিলে নগদে বণ্টন করেন। এই ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে যোগসাজশের সুযোগ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ে বনায়ন সম্প্রসারণ ও পুনবনায়ন কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও দায়বদ্ধতার কার্যকর ব্যবস্থা অনুপস্থিত। রেঞ্জ ও এর নীচের কার্যালয়গুলোর পরিচালন ও সংস্কারসহ নার্সারি ও বন সম্প্রসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ডিএফও কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে অবহিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা নেই। মাঠ পর্যায়ে কাগজে-কলমে বাগান সৃজন ও বন সংরক্ষণ কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে আসলে কতটা হচ্ছে তা যাচাইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা অনুপস্থিত। স্বার্থের সংঘাত থাকায় (বিধিবহির্ভূতভাবে উপার্জিত টাকা ভাগাভাগি) মাঠ পর্যায়ে কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠলেও সংশ্লিষ্ট

---

[২২৮] তথ্যদাতা: একজন বনপ্রহরী - চাঁদপাই রেঞ্জ।

[২২৯] তথ্যদাতা: একজন বিট কর্মকর্তা-ভারপ্রাপ্ত ফরেস্ট রেঞ্জার - টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

[২৩০] তথ্যদাতা: একজন বিট কর্মকর্তা-ভারপ্রাপ্ত ফরেস্ট রেঞ্জার - টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের তা আমলে নিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা ও দায় এড়ানো। এছাড়া তদারকি ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে নেওয়ার উদাহরণ বিরল।

৩.৪.৮.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদারকির ঘাটতি: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের সাথে বিধি-বহির্ভূত লেনদেন ও স্বার্থের সংঘাত থাকায় জবাবদিহিতা ব্যবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে অকার্যকর।

৩.৪.৮.৩ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্নকরণ: সিএজি কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং সদর দপ্তর হতে বিভাগীয় বন কার্যালয় পর্যন্ত নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, মাঠ জরিপ-ভিত্তিক নয়।

বক্স ১৪

"নিরীক্ষা দলের সদস্যদের বন অধিদপ্তরের মতো একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষা করার মতো কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করা যায়। একটি অর্থবছরে কী পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে; রেঞ্জ ও বিট-ভিত্তিক জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণ ও জবরদখলকারী, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। সনাতন নিরীক্ষা দাপ্তরিক নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক হওয়ায় তা দ্বারা বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের গুণগত মানের প্রকৃত চিত্র তুলে আনা সম্ভব নয়। বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক।" (সূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য)

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সিএজি'র কিছু পর্যবেক্ষণ ও আপত্তির ধরনে দেখা যায় - বিক্রীত গাছের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপন না করায় আর্থিক ক্ষতি, অনাদায়ী টাকা, মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও কর্তন না করা, অর্থ অপচয়, ইত্যাদি আপত্তিগুলো উঠে আসলেও তা আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল।

৩.৪.৮.৪ সম্পত্তির হিসাব জমা না দেওয়া: 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯' মোতাবেক সকল বনকর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বা প্রকাশ করা হয় না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

৩.৪.৮.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় ঘাটতি: বন অধিদপ্তরের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ('অনুসন্ধান, অভিযোগ ও পরামর্শ') কার্যকরতায় ঘাটতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কার্যালগুলোতে অভিযোগ গ্রহণের দৃশ্যমান কোনো কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করা যায় নি। এসব কার্যালয়ে পৃথক রেজিস্টারে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ অনুপস্থিত। বন অধিদপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বনকর্মী ও অংশীজন হতে বন অধিদপ্তর ও এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনলাইন, ফোন কল (ল্যাণ্ড ফোন) ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ/দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও তা কাজ করছে না। অভিযোগ জানানোর প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণে অধিদপ্তরের উদ্যোগের অভাব অধিদপ্তরের কর্মীরা কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি, যেমন- সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে দুর্ব্যবহার ও তিরস্কার করা, বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আটকানো, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি করা, ইত্যাদি। ২০২০ সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের কাছে কোনো অভিযোগ জমা না পড়া; এ উক্ত সময়ে পূর্বের অনিষ্পন্ন ১৫৩টি অভিযোগের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ছয়টি (৪%)।

৩.৪.৮.৬ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাগীয় শাস্তির মুখোমুখি না হওয়া: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, বন অধিদপ্তরের প্রায় সকল পর্যায়ের কর্মীদের একাংশ বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কিংবা সুবিধাভোগী। এসব ঘটনা একটি চক্রাকারে সম্পাদিত হয়। অর্থের ভাগ অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের একাংশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয় বলে তথ্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগসহ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ ও প্রভাব থাকায় বনকর্মীদের একাংশ কাজ না করলেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় না অভিযোগ রয়েছে।[২৩১]

৩.৪.৯ বন সুরক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে রামপাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে বলে চিঠি মারফতে উল্লেখ করলেও পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ের (ইআইএ) পর বন অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্পের আর বিরোধিতা করে নি। উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তরও প্রকল্পটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আপত্তি জানায়। এছাড়া ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ এবং সুন্দরবনের জন্য প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেও

[২৩১] তথ্যদাতা: একজন ডিএফও - খুলনা অঞ্চল।

বন অধিদপ্তর প্রকল্পটির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বন্যহাতিসহ বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানসমূহের (ডুলাহাজরা ও মেধাকচ্ছপিয়া) মধ্য দিয়ে দোহাজারী-গুণদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে অধিদপ্তরের সম্মতি জ্ঞাপন সংস্থাটির উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়েছে।

সরকারি বনভূমির সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কর্তৃক শুধু লিখিতভাবে আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত বনভূমির প্রায় এক লক্ষ ৬০ হাজার ২৪০ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ করে নিয়ে গেছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৫: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত বনভূমির পরিমাণ (সর্বমোট: ১৬০,২৩৯.৯১২ একর)

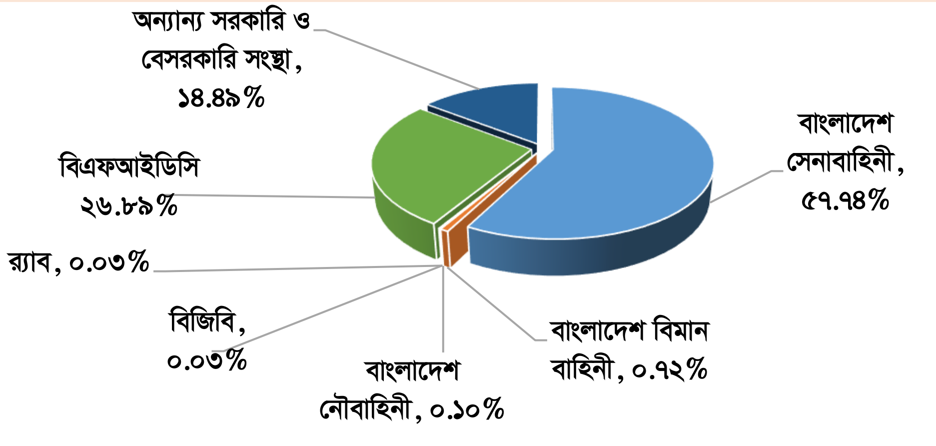

তথ্যসূত্র ও সংগ্রহ: প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, ২৬.০৯.২০২০

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা প্রয়োগ না করা, যেমন- বনের জমিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা দায়ের, ইত্যাদি এবং শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণা প্রাপ্ত তথ্যমতে, কক্সবাজার জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনের অবৈধ স্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ প্রদান; মহেশখালী ও মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প সংলগ্ন উপকূলীয় শ্বাসমূলীয় বন, নদী ও সাগরে প্রকল্পের বর্জ্য ও মাটি ফেলা এবং পাহাড় কেটে প্রকল্পের জমি ভরাট করা হয়েছে। তাছাড়া মহেশখালীতে ১৯২ একর সংরক্ষিত বনভূমির গাছ উজাড় করে অপরিশোধিত তেলের ডিপো ও পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণকালে দুই হাজারের অধিক গর্জন গাছ কর্তনসহ উক্ত প্রকল্পে নিকটস্থ পাহাড় ও বনভূমির মাটি ব্যবহাররোধে অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল। সাঙ্গু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনের ভেতর দিয়ে সড়ক নির্মাণ; টাঙ্গাইলে শালবনের মধ্য দিয়ে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন; রামগড়-সীতাকুণ্ড সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ইত্যাদি কার্যক্রম বন রক্ষার বিপরীতে বন ধ্বংসের উদাহরণ বিদ্যমান। মধুপুর উপজেলা শালবনের ভেতরে ৩০৫ একর এলাকায়জুড়ে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। রামু ও রুমা উপজেলায় সেনানিবাস স্থাপন দ্বারা বন্য হাতির অভয়ারণ্য বিপন্ন করা হয়েছে এবং সিতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলার সংরক্ষিত বন এবং সোনাদিয়া দ্বীপে বিশেষ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করার ফলে বন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছে।

৩.৪.১০ বনভূমি পুনরুদ্ধারে চ্যালেঞ্জসমূহ

২০১৯ সালের ডিসেম্বর অবধি মোট ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি জবরদখল করা হলেও অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ পাঁচ বছরে মাত্র ৮ হাজার ৭৯২ একর (৩%) জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারের পরিমাণ কম হওয়ার পেছনে বন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এক্ষেত্রে জমির দলিল ও নথিপত্র অধিদপ্তরের কাছে চূড়ান্ত অবস্থায় না থাকা ও উদ্যোগের অভাব ছিল। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য মতে, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে থাকা বনভূমির জমি দখলমুক্তকরণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে অধস্তনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বন কার্যালয়গুলো কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য তৎপর না হয়ে শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকা এবং জবরদখলকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শুধু চিঠি আদান-প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকার উদাহরণ রয়েছে। তাছাড়া বনকর্মী কর্তৃক অনৈতিক সুবিধা ও দুর্নীতির মাধ্যমে বনের জমিতে অর্থকরী ফসল আবাদ অব্যাহত

রাখার সুযোগ প্রদান হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আইনপ্রণেতা, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের সহায়তা না পাওয়া এবং বাধা ও চাপ সৃষ্টি করা হয়।

৩.৪.১১ বননির্ভর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.৪.১১.১ বনায়ন ও বন সুরক্ষা কার্যক্রমে বননির্ভর আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক না হওয়া: বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান, কিছু উদাহরণ- 'বন আইন ১৯২৭' ও 'রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭' উপেক্ষা করে তথা বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ না করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ইত্যাদি ঘোষণা; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনে বসবাসরত আদিবাসীদের অধিকারসমূহ, যথা- বনের ভেতর দিয়ে চলাচল, চাষাবাদ, গো-চারণ, ছোট-ছোট বনজ দ্রব্য আহরণ ও ভূমির অধিকার, ইত্যাদি, নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা না করা; সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে স্থানীয় বন-নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালীদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; 'কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার' হিসেবে প্রকৃত সুবিধাভোগী বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে বনের জমিতে বসবাস ও কৃষি আবাদকারী ব্যক্তিদের সুযোগ প্রদান হতে বঞ্চিত করার অভিযোগ, ইত্যাদি।

৩.৪.১২ অংশীজনের সমন্বয়ে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাথে বন বিভাগের সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান, কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

৩.৪.১২.১ অবৈধ স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান: পল্লীবিদুৎ সমিতি কর্তৃক কক্সবাজার এলাকায় বন বিভাগের সাথে আলোচনা ও বাচ-বিচার না করে বনের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা বাড়ি-ঘর ও স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

৩.৪.১২.২ পুলিশ প্রশাসনের চাহিদামাফিক সহায়তা না পাওয়া: বনের জমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও জমি উদ্ধার, জমি বেদখল হওয়ার সময়ে বন বিভাগের অনুরোধে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তাৎক্ষণিক সাড়া না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সরকারি বনের জমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজে সহায়তার জন্য স্থানীয় থানায় বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা না দেয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে সহায়তা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বনকর্মীদের নিজেদের পকেট হতে বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা দিয়ে বেদখল হওয়া বনের জমি উদ্ধারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হয়।[২৩২] এছাড়া অবৈধভাবে বনের জমি দখলকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও পুলিশ প্রশাসনের অবস্থান নেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।[২৩৩] এমতাবস্থায়, ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের বেতনের টাকা খরচ করে বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারসহ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আগ্রহী হন না।[২৩৪]

[২৩২] তথ্যদাতা: একজন বিট অফিসার - কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[২৩৩] তথ্যদাতা: একজন প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৩৪] তথ্যসূত্র: বিট পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের প্রদত্ত তথ্য।

চতুর্থ অধ্যায়: বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম

বর্তমান গবেষণায় সরকারি বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরে শুদ্ধাচার চর্চায় বিচ্যুতির ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রার ওপর তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর, রেঞ্জ ও বিট কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রাধান্য পেয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য কেইস স্টাডিসহ উপস্থাপনা করা হয়েছে।

৪.১ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী ও উচ্চ পর্যায়ের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বন অধিদপ্তর কেন্দ্রিক ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।[২৩৫] বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একাধিক মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক বন রক্ষার দিকে কার্যত নজর না দিয়ে নিজেদের পদ-পদবি ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নসহ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বনকর্মীদের নিকট হতে কীভাবে ও কতটা বিধি-বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায়- এসব বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী ও মনোযোগী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২৩৬] ক্ষেত্র বিশেষে নীতিনির্ধারকদের একাংশ কর্তৃক বনকর্মীদের উপর চাপ প্রয়োগ করে বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে (বক্স ১৭ দেখুন)। বন প্রকল্পের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন মন্ত্রী তার ব্যক্তিগত সহকারীকে 'ক্যাশিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করারও অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য ঘুষবাবদ সংগৃহীত টাকাসহ ধরা পড়া উক্ত ব্যক্তিগত সহকারী বর্তমানে একটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

বক্স ১৫

"একজন বন কর্মকর্তা খুলনা অঞ্চলে ডিএফও হিসেবে যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যে বন সংশ্লিষ্ট তৎকালীন মন্ত্রী অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের ঠিকাদারকে প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়া সত্ত্বেও পুরো বিল দেওয়ার জন্য ডিএফওকে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত ডিএফও স্ব-শরীরে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পটির দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখতে না পেয়ে উক্ত বিল প্রদানে মন্ত্রীর কাছে অপারগতা পোষণ করেন। এতে উক্ত মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট ঠিকাদারকে প্রকল্পের পুরো বিল দু'দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য পুনরায় চাপ প্রয়োগ করেন। এমতাবস্থায়, উক্ত ডিএফও তৎকালীন সিসিএফ হিসেবে আমাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন। আমি মন্ত্রীকে বিলটি পরিশোধ করা ঠিক হবে বলে না বলে জানালে তিনি আমার কোনো কথা শুনতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সে সময় উক্ত মন্ত্রী সরকারি কাজে উক্ত ডিএফও এর কর্ম এলাকায় যান এবং উক্ত ডিএফওকে দেখামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন। সেসাথে নির্দেশমতো বিল পরিশোধ না করায় ডিএফওকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এই বিব্রত অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে উক্ত ডিএফও বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে বা অন্যত্র বদলির জন্য আবেদন করেন। বদলি সংক্রান্ত আবেদনে আমার দপ্তর সম্মতি জ্ঞাপন করলেও উক্ত মন্ত্রীর অভিপ্রায় মোতাবেক মন্ত্রণালয় বদলির আবেদন চূড়ান্তভাবে তা অনুমোদন করে নি। এই পরিস্থিতিতে উক্ত ডিএফও নিজের চাকরি, আত্মসম্মান ও জীবনের নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।" - একজন উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তার মন্তব্য

৪.২ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

৪.২.১ নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রধান বন সংরক্ষকের পদটিসহ প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে দরকষাকষির মাধ্যমে পদোন্নতি কিংবা পদায়ন হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৩৭]

৪.২.১.১ 'প্রধান বন সংরক্ষক' হিসেবে নিয়োগ: বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও উচ্চ পর্যায়ের একাংশকে বিধিবহিভূতভাবে টাকা দিয়ে প্রধান বন সংরক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, নীতিনির্ধারক ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের প্রভাব কাজে লাগাতে পারেন এমন ব্যক্তি প্রধান বন সংরক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান, তবে এর ব্যতিক্রম উদাহরণও রয়েছে।[২৩৮]

---

[২৩৫] তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা (প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম কর্মী)

[২৩৬] তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা (প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম কর্মী)

[২৩৭] তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা (প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম কর্মী)

[২৩৮] প্রাগুপ্ত।

৪.২.১.২ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ: বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ/পদায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সুবিধা মূলত মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক, কর্মকর্মীদের একাংশ ভোগ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৩৯] তবে বিনিয়োগকৃত টাকা প্রকল্প হতে সহজে তুলে নেওয়ার সুযোগ আছে বলে প্রকল্পের পরিচালক হওয়ার জন্য বনকর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও তদ্বির হয়। উল্লেখ্য, ট্রাস্ট ফান্ডসহ ওয়াইল্ড লাইফ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোতে অর্থ আত্মসাতের বেশি সুযোগ থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে কিছু টেকনিক্যাল পদ আছে, যা চালাতে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয়, সেসবের কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত ঘুষবিহীন নিয়োগ হয়।[২৪০]

৪.২.২ বদলি ও পদায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বন অধিদপ্তরের কর্মীদের বদলি ও পদায়ন কার্যক্রমে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। প্রথম থেকে দশম বেতন গ্রেডভুক্ত বন কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের ক্ষমতা মূলত মন্ত্রণালয়ের হাতে। এগারো ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের বনকর্মীদের বদলি ও পদায়ন বন অধিদপ্তর করে থাকে। কাগজে-কলমে বিধি-মোতাবেক বদলি করা হলেও বাস্তবে বিধি-বহির্ভূত টাকা লেনদেন বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ছাড়া বনকর্মীদের প্রত্যাশিত এলাকা বা অঞ্চলে বদলি হওয়া যায় না। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন ও পোস্টিং পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একাংশকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয় বলে তথ্য রয়েছে।[২৪১]

বক্স ১৬

"কোনো কর্মকর্তার বদলি বা পদায়ন কোথায় হবে সেটি নির্ভর করে উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সাথে নেগোশিয়েশন ও প্রভাব বিস্তারের ওপর। যেসব এলাকা ও কার্যালয়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে সেসব স্থানে টাকা লেনদেন করে বদলি ও পদায়নের প্রাপ্তি ঘটনা অনেকটা অলিখিত বিধান। একজন সাবেক মন্ত্রী কর্তৃক তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে মাসিক কিস্তিতে ও থোক হিসেবে এই টাকা গ্রহণ করতেন। সরকারি বন উজাড় ও বনের জমি বেদখল হওয়ার প্রধান কারণ এই পোস্টিং ও বদলি বাণিজ্য।"- একজন ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তার মন্তব্য

৪.২.২.১ 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' [২৪২]এলাকায় বদলি ও 'পোস্টিং' প্রদানে দুর্নীতি: প্রাপ্ত তথ্য মতে, বনকর্মীদের একাংশের বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে কর্ম এলাকা, কাজের ধরন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগের ওপর অনিয়মের ধরন ও মাত্রা নির্ভর করে। এছাড়া আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ ও মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে বনের ধরন, বনজ সম্পদের প্রাপ্যতা ও বনের জমির চাহিদার তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। অধিকন্তু ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে পদ, বিভাগের অবস্থা, সম্পদ ইত্যাদির ওপর।[২৪৩]

বন অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্ম এলাকাকে 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' ও 'আর্থিকভাবে লোভনীয় নয়'[২৪৪]- এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়।[২৪৫] উল্লেখ্য, দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা, 'সুন্দরবন'[২৪৬] ও 'শালবন এলাকা'[২৪৭] দেশে 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকা হিসেবে পরিচিত। এছাড়া 'বন চেক স্টেশনগুলো' আরো বেশি 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' হিসেবে বনকর্মীদের কাছে স্বীকৃত। প্রাপ্ত তথ্য মতে, 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকায় পোস্টিং পাওয়ার জন্য বনকর্মীদের একাংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও তদ্বির হয়। এক্ষেত্রে বনকর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে টাকা বিনিয়োগ করতে না পারলে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব ও বন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে বনকর্মীদের একাংশকে 'আর্থিকভাবে লোভনীয় নয়' এলাকায় কর্মজীবন পার করতে হয়। সুতরাং বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যেসব কর্মীর যোগাযোগ যতো বেশি এবং এর পাশাপাশি সহকর্মীদের তুলনায় বেশি পরিমাণ ঘুষ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে সেসব কর্মী রিসোর্সফুল এলাকায় পোস্টিং লাভ করেন।[২৪৮]

বক্স ১৭

---

[২৩৯] প্রাগুপ্ত।

[২৪০] প্রাগুপ্ত।

[২৪১] তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা (প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম কর্মী)।

[২৪২] বন অধিদপ্তরের যেসব কার্যালয়, প্রকল্প ও কর্ম এলাকা বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি তা বনকর্মীদের নিকট 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' হিসেবে গণ্য। 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকাগুলোতে দাতাসংস্থা ও সরকারি অর্থায়নে বনায়ন, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় যা হতে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বিদ্যমান।বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ পাওয়া বা উপর্জনের সুযোগ আছে এমন পদ ও কর্মস্থল এলাকা।দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা ও বাগেরহাট, ইত্যাদি জেলায় অবস্থিত বন বিভাগের চেক স্টেশনগুলোও বিশেষ 'রিসোর্সফুল' অফিস হিসেবে পরিচিত।

[২৪৩] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৪৪] বন ও বনজ সম্পদে ভরপুর ও বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ নেই।

[২৪৫] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৪৬] এখানে গোলপাতা, মধু ও মৎস্য আহরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত পারমিট প্রদান করা হয়। এখানে ভূমিদস্যুদের সাথে আতাঁত করে বনের জমি বেদখলের ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়ে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বিদ্যমান।

[২৪৭] এখানে ভূমিদস্যুদের সাথে আতাঁত করে বনের জমি বেদখলের ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়ে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বিদ্যমান।

[২৪৮] তথ্যসূত্র: বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ।

> "রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বা ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে লোভনীয় জায়গায় পোস্টিং পেতে কোনো কোনো কর্মকর্তাদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। ভাল পদ ও স্টেশনে পদায়নের জন্য টাকা খরচ করতে কারো দ্বিধা নেই। তাই যার টাকা ও খুঁটির জোর বেশি সে ততো আর্থিকভাবে লোভনীয় জায়গায় পোস্টিং বা বদলি হওয়ার সুযোগ পায়। আমার দু'টিই কম বিধায় উত্তরবঙ্গের একটি জেলায় বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আমি উপকূলীয় এলাকার একটি ফরেস্ট রেঞ্জের দায়িত্বে আছি।"- একজন ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তার মন্তব্য

যেসব বনকর্মী টাকা দিয়ে চ্যানেল ম্যানেজ করতে পারে সে-ই প্রত্যাশিত পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির আদেশ পায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৪৯] এভাবে 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকায় বদলি ও পদায়নে আর্থিক দুর্নীতির আধিক্য বেশি।[২৫০]

সারণি ৮: পদোন্নতি, বদলি/পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন

পদ*	লেনদেনের ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ*	অর্থের গ্রহিতা*
প্রধান বন সংরক্ষক	পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ	১ - ৩ কোটি	মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও ব্যক্তিগত সহকারী এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
বন সংরক্ষক	নিয়োগ ও বদলি	২০ - ২৫ লক্ষ	
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পদোন্নতি/বদলি	১০ লক্ষ - ১ কোটি	
প্রকল্প পরিচালক	নিয়োগ/পদায়ন	১ - ১.৫ কোটি	
সহকারী বন সংরক্ষক	বদলি	১ - ৫ লক্ষ	
রেঞ্জ কর্মকর্তা	বদলি	৫ - ১০ লক্ষ	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় বন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
চেক স্টেশন-ইন-চার্জ	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
ফরেস্টার	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
বিট কর্মকর্তা	বদলি	২ - ৫ লক্ষ	
বন প্রহরী	বদলি	০.৫ - ২.৫ লক্ষ	

*প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

(তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের একাধিক প্রধান বন সংরক্ষক, বর্তমান ও প্রাক্তন বনকর্মী এবং গণমাধ্যম কর্মী)

প্রাপ্ত তথ্য মতে, যেসব এলাকায় অবৈধ আয়ের সুযোগ বেশি সেখানে পদায়ন বা বদলি হওয়ার ক্ষেত্রে টাকা বেশি লাগে। ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত নারায়গঞ্জ জেলার সোনারগাঁও চেক স্টেশন। এখানে পোস্টিং পেতে দেশের সকল এলাকার মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়। এই স্টেশনে কর্মরত থাকা অবস্থায় কাঠ ও আসবাবপত্রবাহী পরিবহন যানবাহন হতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় দ্বারা ঘুষ প্রদানবাবদ বিনিয়োগকৃত টাকা সহজে তোলা যায়।

৪.২.২.২বদলির আদেশ জারিতে অনিয়ম: সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া অপছন্দের কর্মীদের নির্ধারিত মেয়াদ তথা দু'বছর পার হওয়ার পূর্বে বদলির অর্ডার ইস্যু করার অভিযোগ রয়েছে। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল তথা বন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় এলাকায় এ ধরনের ঘটনার আধিক্য বেশি। এসব এলাকায় বন বিভাগের জমি প্রভাবশালীদের দ্বারা জমি বেদখলের ক্ষেত্রে বন কর্মকর্তাদের একাংশ সম্পৃক্ত থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.২.২.৩ বদলির ওর্ডার ইস্যুর পরও দায়িত্বে বহাল রাখা: রেঞ্জ ও চেক স্টেশনের বনকর্মীদের বদলি আদেশ হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বিধিবহির্ভতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে এমন কার্যালয়ে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ডিএফওদের একাংশ মূলত বিশ্বস্ত কর্মীদের মাধ্যমে ফিল্ড হতে লক্ষ্য মোতাবেক বিধি-বহির্ভতভাবে টাকা সংগ্রহের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিট ও রেঞ্জ পর্যায়ের বদলির আদেশ জারির পরও তা উপেক্ষা করে বিশ্বাসভাজন কর্মীদের অনির্দিষ্টকাল বা মাসের পর মাস রেখে দেন। তবে যেসব কর্মীর ওপর তাদের আস্থা কম তাদেরকে আদেশ জারির পর কালক্ষেপণ না করে নিয়মমাফিক ও দ্রুততার সাথে বদলির আদেশ কার্যকর করা হয়।[২৫১]

৪.২.২.৪ বদলির আদেশ ব্যবহার করে কাঠ পাচার ও বন উজাড়: সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের বদলির আদেশ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় অলিখিতভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক চাকরিজীবীদের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল হতে দেশের অন্যত্র 'বদলি আদেশ' কাঠের আসবাবপত্র ব্যবসায়ীদের একাংশের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন চেকপোস্ট (বন বিভাগের চেকস্টেশনসহ) সরকারি চাকরিজীবীদের (সামরিক ও বেসামরিক) বদলি আদেশপত্র প্রদর্শন করামাত্র কাঠের আসবাবপত্রসহ মালবাহী মোটরযানে কী ধরনের আসবাবপত্র আছে সাধারণত তা পরীক্ষা করা হয় না, আর করা হলেও তা দায়সাড়াভাবে করা হয়। এই সুযোগটি (যথা- সরকারি

[২৪৯] তথ্যসূত্র: একজন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৫০] তথ্যসূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৫১] তথ্যসূত্র: একজন বিট কর্মকর্তা।

কর্মচারীদের বদলির আদেশ ব্যবহার) কাজে লাগিয়ে কাঠের আসবাবপত্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছামাফিক সাধারণ ক্রেতাদের আসবাবপত্র চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল হতে দেশের অন্যত্র পাঠিয়ে থাকেন। এর বিনিময়ে কাঠের আসবাবপত্র ব্যবসায়ীদের একাংশ বদলির আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.২.২.৫ বনকর্মীদের বদলি ও পোস্টিং কর্মকাণ্ডে বাইরের চাপ

৪.২.২.৫.১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের চাপ: বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী ও সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের (সচিবদের একাংশ) কাছ থেকে বন অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের বিধিবহির্ভূতভাবে বদলি ও পদায়নের জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ১৮

"একজন মন্ত্রী তাঁর এক আত্মীয়কে (ঢাকার বাইরে বিট কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত একজন বনকর্মী) নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও-এ অবস্থিত বন বিভাগের চেকপোস্টে বদলির জন্য আমাকে ফোন করেন। মন্ত্রীকে বললাম, সোনারগাঁও চেক পোস্টটি বন বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট, কারণ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ হতে কাঠ ও বন সম্পদ নিয়ে ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পথ এবং এখানে একজন কর্মীকে ক্ষেত্র বিশেষে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। এছাড়া তিনি কেন তাঁর আত্মীয়কে ঐ চেকপোস্টে বদলির জন্য তদবির করছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রতিউত্তরে মন্ত্রী বলেছেন, তাঁর আত্মীয়ের বনের ভেতরে ডিউটি করতে ভালো লাগে না এবং তাছাড়া চেকপোস্টটিতে উপরি আয় ও বকশিশ প্রাপ্তির সুযোগ বেশি।"- সংশ্লিষ্ট এলাকার তৎকালীন একজন ডিএফও এর মন্তব্য

৪.২.২.৫.২ রাজনৈতিক চাপ: বনকর্মীদের বদলি ও পদায়ন ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ও অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ বিভিন্ন সময় তাদের পছন্দনীয়/আত্মীয়/পরিচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির জন্য তদবির করেন। যেসব ডিএফও অনিয়মের মাধ্যমে পদায়িত হন তারা সাধারণত রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন।[২৫২] কখনো কখনো তারা প্রধান বন সংরক্ষকসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে বনকর্মীদের নির্দিষ্ট স্থানে বদলি ও পদায়নের জন্য তদবির করেন। একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা একজন বনকর্মীর একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বদলির জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ডিএফও তা উপেক্ষা করেন। এমতাবস্থায়, উক্ত রাজনৈতিক নেতা স্থানীয় একটি রাজনৈতিক সমাবেশে তৎকালীন উক্ত ডিএফও এবং প্রধান বন সংরক্ষককে দেখে নেবেন বলে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২৫৩]

বক্স ১৯

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একটি অংঙ্গ সংগঠনের সাবেক সভাপতি বন অধিদপ্তরে একজন কর্মকর্তার বদলির তদবির নিয়ে আমার কক্ষে (সিসিএফ) করে প্রবেশ করে আমাকে ভাই বলে সম্মোধন করে বদলির জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত কর্মকর্তার বদলির এখতিয়ার আমার নেই বলে অবহিত করলেও যেভাবেই হোক তা করার জন্য আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আমি এতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে আমার কক্ষ থেকে বেড়িয়ে যায়। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে তৎকালীন একজন মন্ত্রী বন অধিদপ্তরের একটি অনুষ্ঠানে উক্ত ছাত্র নেতার আবদারটি পূরণের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন এবং এর অন্যথা হলে উক্ত ছাত্রনেতা ক্ষতি করতে পারে বলেও উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায় আমার পরিবার ও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ি। আমি পুরো ঘটনাটি বন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবকে অবহিত করি, কিন্তু তাঁরা উভয়েই আমাকে সমর্থন কিংবা সহায়তা না দিয়ে উক্ত ছাত্র নেতার অনুরোধমতো কাজ করার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। তবে শেষ পর্যন্ত আমি বদলির কোনো আদেশ ইস্যু করি নি।"- তৎকালীন একজন প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য

৪.২.২.৫.৩ ট্রেড ইউনিয়নের চাপ: বনকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে কর্মীদের বদলির জন্য চাপ থাকে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের একাংশের সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাজনৈতিকভাবে ভাল যোগাযোগ আছে এমন বনকর্মীদের একাংশ বদলি ও পদায়ন নিয়ে তদ্বির করে থাকে। একজন বন প্রহরীর চাহিদামাফিক বদলির জন্য রাজী না হওয়া তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষকে দেখে নেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়ার তথ্য রয়েছে।[২৫৪] এমতাবস্থায় ক্ষেত্র বিশেষে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একাংশের চাপের মুখে বনকর্মী বদলি করতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.২.২.৬ পদোন্নতি, বদলি ও পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়া: প্রাপ্ত তথ্য মতে, নিয়োগ, বদলি ও পদায়নে লেনদেনকৃত ঘুষের পরিমাণ লক্ষাধিক বা তার বেশি হলে তা কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সাধারণত অধস্তন

[২৫২] তথ্যদাতা: বনকর্মীদের একাংশ।

[২৫৩]তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

[২৫৪] তথ্যসূত্র: তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষক।

ও বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মাধ্যমে এই লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।[২৫৫] নিকট অতীতে একজন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বন কর্মকর্তাদের একাংশের যারা বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে উক্ত কর্মকর্তার সহকর্মী বা ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত এমন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাকে/তাদেরকে রাজী করানো হয়। এক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীকে বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয়।

৪.২.২.৭ বিনিয়োগকৃত অর্থ বিধিবহির্ভূতভাবে তুলে নিতে অনিয়মে জড়িয়ে পড়া: প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়ে বদলি ও পদায়ন নিয়ে কর্ম এলাকায় আসার পর তা তুলে নিতে বেগ পেতে হয় না।[২৫৬] বিধিবহির্ভূতভাবে বিনিয়োগকৃত টাকা কর্ম এলাকা হতে তুলে নিয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বনকর্মীরা বনকেন্দ্রিক অপরাধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা লেনদেন করে বনকর্মীদের পোস্টিং দিয়ে সরকারি বন উজাড় ও বনের জমি জবরদখল হওয়ার ঘটনা কখনো বন্ধ করা যাবে না বলে বনকর্মীদের অভিমত।[২৫৭] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারক ও বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের একাংশের 'পোস্টিং বাণিজ্য' বন উজাড় হওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী বলে বর্তমান ও সাবেক বন কর্মকর্তাদের একাংশের অভিমত। এসব ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দায় এড়াতে পারে না বলে বনকর্মীদের অভিমত রয়েছে।[২৫৮]

৪.২.৩ মাঠ মর্যায়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানে অনিয়ম

ক্ষেত্র বিশেষে 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকাগুলোতে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া, যেমন- শূন্য হওয়া পদ সাময়িকভাবে পূরণের লক্ষ্যে একজন বনকর্মীকে দুই বা ততোধিক বিট এবং একইসাথে একটি চেকস্টেশনের পাশাপাশি বিট কার্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মূলত বিট কার্যালয় হতে বিধি-বহির্ভূতভাবে টাকা সংগ্রহের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিট কর্মীদের মধ্যে বিশ্বস্তদের একাংশকে একাধিক বিট কার্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[২৫৯]

৪.২.৩.১ বদলি ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত: বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলি ও পদায়ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে বন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একাংশ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম হতে নবম গ্রেডভুক্ত বনকর্মীদের (প্রধান বন সংরক্ষক ও বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকসহ) একাংশের বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ এবং দশম থেকে বিশ গ্রেডের বনকর্মীদের একাংশ প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের একাংশকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন করতে হয়। সাবেক একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী একজন মন্ত্রীর ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। উক্ত সহকারী ৩০ লক্ষ টাকাসহ আটক হন। এই টাকার মধ্যে মন্ত্রীর ভাগের অংশ কাছে ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৬০] অপর একটি ঘটনায় দেখা যায়, তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষকের সরকারি বাসা হতে গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সরকারি বাসার চালের ড্রাম, বালিশ ও তোশকের ভেতর থেকে ১ কোটি ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৬০০ টাকাসহ ২৯০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৪১ লাখ ১১ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের সঞ্চয়পত্র উদ্ধার করে। পরবর্তীতে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় চাকরিচ্যুত প্রধান বন সংরক্ষককে ২০০৮ সালের ৫ জুন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ১২ বছর কারাদণ্ড ও 'সম্পত্তি'[২৬১] বাজেয়াপ্ত করে যা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও নিম্ন আদালতের সাজা বহাল রাখে।[২৬২]

৪.২.৪ নেতিবাচক মূল্যায়ন হতে রক্ষা পেতে অনিয়ম

বন কর্মকর্তাদের একাংশ তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয় ফাইলে নেতিবাচক মন্তব্য হতে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের একাংশকে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৬৩]

---

[২৫৫] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও বন অধিদপ্তরে বর্তমানে কর্মীদের একাংশ।

[২৫৬] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বনকর্মীদের একাংশ।

[২৫৭] তথ্যদাতা: সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ও বন অধিদপ্তরে বর্তমানে কর্মীদের একাংশ।

[২৫৮] তথ্যদাতা: একজন সাবেক উর্ধ্বতন বন কর্মকর্তা।

[২৫৯] তথ্যসূত্র: একজন বিট কর্মকর্তা।

[২৬০] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক, বর্তমান বন কর্মী ও গণমাধ্যম কর্মীদের একাংশ।

[২৬১] সিসিএফ এর নামে থাকা ১ কোটি ৮০ লাখ ও স্ত্রীর নামে থাকা ২ কোটি ৮০ লাখ এবং ২৭০ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন। উল্লেখ্য, সাজাভোগ শেষে সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ওসমান গণি ২০১৬ সালে মুক্তি পান।

[২৬২] 'বনের রাজা ওসমান গণির শাস্তি বহাল', *প্রথম আলো*, ২২ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/bkABN, ভিজিট করা হয়েছে: ২৭ জানুয়ারি ২০২০।

[২৬৩] তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের একজন সাবেক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা।

৪.৩ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

৪.৩.১ ক্ষমতা অব্যবহার

৪.৩.১.১ সরকারি বনভূমির জমি দখল: প্রাপ্ত তথ্য মতে, সিলেট অঞ্চলে একজন ডিএফও বনের জমি দখল করতে যেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এসি ল্যান্ডের হাতে ধরা পড়েন। পরবর্তীতে সরকারি বনের বেদখলকৃত জমির ভাগ উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে সমান পরিমাণ ভাগ দেওয়ার মাধ্যমে ঘটনাটির ধামাপাচা দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় বন কর্মকর্তা ও ভূমি প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত দু'জন সরকারি কর্মকর্তাসহ তিনজন মিলে সংগবদ্ধভাবে সরকারি বনের জমি নিজেদের দখলে নিয়ে নেন। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর, চন্দ্রা, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, সফিপুর ইত্যাদি উপজেলায় সরকারি বনের খাসজমি ও বনভূমির দাগ ও খতিয়ানে বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে তা বেদখলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩.১.২ দুর্নীতিতে সহায়তা না করার অধস্তন বনকর্মীদের শাস্তিমূলক বদলি: চট্টগ্রাম সার্কেলের একটি বিটের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রেঞ্জার ও ডিএফও এর কথামতো কাজ না করায়, যেমন- বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া সংরক্ষিত বনের গাছ কেটে তা পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার পথে আটক ও বাজেয়াপ্ত করায়, সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলার কারণে গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়। মূলত ফরেস্ট রেঞ্জারের কথামতো অবৈধভাবে কর্তনকৃত গাছ নির্বিঘ্নে পরিবহন বাধাসৃষ্টি না করার পরামর্শ ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩.১.৩ জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ চুরি: প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশের তিনটি পার্বত্য জেলায় সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ উজারের প্রধান ও নিরাপদ মাধ্যম হলো 'জোত পারমিট'[২৬৪]। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার আওতাভুক্ত সংরক্ষিত বনের দুর্গম এলাকার অভ্যন্তরে ব্যক্তি মালিকানাধীন যেসব বন বা 'জোত' রয়েছে তা স্থানীয় বনকর্মীদের জানা। কাঠ ব্যবসায়ী ও স'মিল মালিকরা ব্যক্তিমালিকানাধীন বন বা জোতের নির্দিষ্ট সংখ্যাক গাছ কাটার লক্ষ্যে প্রথমে বন বিভাগ থেকে জোত পারমিট সংগ্রহ করেন। ব্যবসায়ীদের একাংশ জোতের গাছ কাটার সময় জোতের পার্শ্ববর্তী সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ (বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির গাছসহ) কেটে থাকেন। সরকারি বনের গাছ অবৈধভাবে কাটার পর তা বন হতে স'মিলে নেওয়া পর্যন্ত পুরো পথ বা রুটের সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসন ও সংস্থা (বন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মীসহ) এবং স্থানীয় সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে ঘুষ দিয়ে বা প্রভাব কাজে লাগিয়ে ম্যানেজ করা হয়। উল্লেখ্য, অবৈধভাবে গাছ কেটে তা পার্বত্য অঞ্চলে থাকা বন বিভাগ ও নিরাপত্তা চেকপোস্ট এড়িয়ে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের বিকল্প কোনো পথ দিয়ে তা জেলা শহরগুলোতে নেওয়া অসম্ভব।

বক্স ২০

"চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহের বনভূমির গাছ কাটার জন্য একজন কাঠ ব্যবসায়ী প্রতি মৌসুমে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে। সাধারণত চকোরিয়া, পেকুয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার ও উখিয়া উপজেলা থেকে এসব শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। শ্রমিকদের এই দলকে প্রায় তিন মাসের জন্য বনে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়। জোতের গাছ ও কাঠ সংগ্রহ করার জন্য বনের ভেতরে তারা তাবু টানিয়ে কিংবা সংশ্লিষ্ট পাড়ার সাথে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস করে। ব্যবসায়ীর সাথে স্থানীয় পাড়ার হেডম্যান/কারবারির সাথে যোগাযোগ হয়। ব্যবসায়ীরা প্রধানত হেডম্যান/কারবারির সাথে যোগযোগ করে প্রয়োজনীয় গাছের অবস্থান জেনে নেয়। হেডম্যান/কারবারি পাহাড়ের গাছগুলো চিনিয়ে দেয়, এ জন্য হেডম্যান/কারবারি গাছ প্রতি টাকা পান। স্থানীয়ভাবে শ্রমিকদেরকে পরিচালনা করে হেডম্যান/কারবারি। গাছ প্রতি টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে গাছের/কাঠের ধরনের উপরেও হেডম্যান/কারবারির টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বিলুপ্তপ্রায় গাছের দাম সবচেয়ে বেশি, যেমন- চাম্পাফুল গাছ। এ ধরনের বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় গাছগুলোর অবস্থান ব্যবসায়ী কিংবা শ্রমিকদের জানার কথা নয়, কারবারি/হেডম্যানরা এই ধরনের দামী গাছগুলোর অবস্থান জানে। তারা পথ দেখিয়ে এসব গাছের কাছে নিয়ে যায় শ্রমিকদের। হেডম্যান/কারবারি গাছ বিক্রি হতে প্রাপ্ত অর্থ একা নেন না। ঐ পাড়ার সকলের মধ্যে তারা টাকাগুলো ভাগ করে দেয়। ফলে ঐ পাড়ার লোকজনও বনের গাছ কেটে নিতে শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। শ্রমিকদের প্রাত্যহিক বাজারের ব্যবস্থাও করা হয় ঐ সকল পাড়ার লোকজনের সহযোগিতায়। গাছ কাটার পর তা ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে পরিবহনের জন্য রাস্তায় আনা হয়। কখনো কখনো পোষাহাতি দিয়ে গাছ/কাঠ টেনে রাস্তায় আনা হয়। তারপর বিভিন্নভাবে এই গাছ/কাঠ বিভিন্ন উপায়ে শহরে নিয়ে আসা হয়। কখনো তা পাহাড়ী ছড়া (খাল) বা নদী দিয়ে ভাসিয়ে আনা হয় এবং কখনো তা ট্রাকে করে আনা হয়।" - চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বন উজাড়ের উপর অনুসন্ধ্যানী প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এমন একজন সাংবাদিকের মন্তব্য।

জোত পারমিটের আড়ালে কাঠ ব্যবসায়ীরা বনকর্মীদেরকে জানিয়ে, অবহিত করে ও যোগসাজসে পার্বত্য অঞ্চলের গভীর বন হতে গাছ কেটে স'মিলে এনে থাকেন। স্থানীয় বনকর্মীরা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধভাবে গাছ কাটা তথা বৃক্ষ উজারের

[২৬৪] খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার আওতাভুক্ত সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের ভেতরে থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি জোত হিসেবে পরিচিত। এই জোতে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা বা লাগানো গাছ কেটে বিক্রি করার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন বনের গাছ হতে প্রতিবার নির্দিষ্ট সংখ্যাক গাছ কাটার জন্য বন বিভাগ হতে যে অনুমতি গ্রহণ করতে হয় তা হলো জোত পারমিট। এই পারমিট হতে গাছ হতে গাছের আকারভেদে সরকার রাজস্ব পেয়ে থাকে।

ঘটনা দেখে ও জেনেও না দেখাসহ অতিরিক্ত কর্তনকৃত গাছ জব্দ করাসহ আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তাদের একাংশের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়েও অবৈধভাবে কাটা গাছে লট বন বিভাগের চেকপোস্টগুলো নির্বিঘ্নে পার হওয়া যায়।

৪.৩.১.৪ পার্বত্য অঞ্চলের মূল্যবান ও বিরল প্রজাতির গাছ উজাড়: কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্যবান ও বিরল প্রজাতির গাছ, যেমন-চাপালিশ ও চম্পাফুল গাছের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য বনকর্মীদের নিকট হতে সংগ্রহ করে জোত পারমিটের আড়ালে তা কেটে উজাড় করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বনকর্মীদের সাথে দরকষাকষির দ্বারা ঘনফুটপ্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ ঘুষ দিতে পারে এমন ব্যবসায়ী সরকারি বনের বিরল প্রজাতির মূল্যবান ও নিষিদ্ধ পাহাড়ী গাছ কেটে নেওয়ার সুযোগ পায়। সরকারি বনের গাছ অবৈধভাবে কাটতে দা ব্যবহার করা হয়, কারণ সংরক্ষিত বনের ভেতরে করাত নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। তবে কারো কারো করাত আগে থেকে গভীর অরণ্যের ভেতরে বসবাসকারী মানুষের বাড়িতে রেখে দেয়া হয়, যাতে তা সময় ও সুযোগমতো ব্যবহার করা যায়।

৪.৩.১.৫ বন উজারের ঘটনায় বনকর্মীদের একাংশের নির্লিপ্ততা: মধুপুরের শালবন এলাকায় থাকা রাবার বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা বন বিভাগের কর্মীদের সাথে যোগসাজশে রাবার বাগানের আশেপাশের বন কেটে উজাড় করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩.১.৬ ক্ষমতার বৈষম্যমুলক প্রয়োগ দ্বারা আদিবাসীদের ভূমি হতে উচ্ছেদ: বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনবাসীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক কয়েক হাজার ভুয়া মামলা দায়েরের অভিযোগ রয়েছে। বনকর্মীদের একাংশের ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ না করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বনজীবীদেরকে ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলকৃত ভূমি হতে জোরপূর্বক উৎখাতের উদাহরণ রয়েছে (বক্স ২২)।

বক্স ২১

সম্প্রতি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) টাঙ্গাইল বন বিভাগ মধুপুর উপজেলার অরণখোলা মৌজায় একটি আদিবাসী পরিবারের বংশ পরম্পরায় চাষাবাদকৃত জমিতে (৪০ শতক) গড়ে ওঠা কলাবাগান জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। উক্ত উচ্ছেদ অভিযানের আগে কলাচাষীকে অবহিত করা হয় নি। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের সাথে বনকর্মীদের একাংশের বিধিবহির্ভূত লেনদেনের সম্পর্ক থাকায় একই মৌজায় প্রভাবশালীদের জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

৪.৩.২ দায়িত্ব অবহেলা

৪.৩.২.১ বনের জমি বেদখল রোধে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কার্যকর ভূমিকা না নেওয়া: প্রাপ্ত তথ্য মতে, বন অধিদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি বনের জমি লিজ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসনের একাংশ কর্তৃক ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে বন ও বনভূমির জমি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, কোম্পানি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাছে লিজ দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায়, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, হবিগঞ্জ টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলাসহ সুন্দরবন এলাকা ও উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি এলাকায় লিজ দেওয়া হয়েছে।”[২৬৫]২০০৭ সালে চলেশ রিচিলের মৃত্যুর পর স্থানীয় গাড়ো সম্প্রদায়ের একাংশ প্রায় দুই শতাধিক একর শালবনের গাছ কেটে তা কৃষি জমিতে রূপান্তর করে কৃষি (কলা, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি) আবাদ করে আসছে। এই জমি উদ্ধার করার জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

৪.৩.২.২ ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা: বনকর্মীদের কেউ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কোনো অনৈতিক বা আইন-বহির্ভূত কাজে সহায়তা বা অংশীদার হতে অপারগাতা প্রকাশ করলে কিংবা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধির বন দখলের ঘটনায় বাধা সৃষ্টি করলে তার শাস্তি হিসেবে অন্যত্র বদলি হতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তাদের একাংশের কাছ থেকে বাধা পেয়ে কিংবা প্রয়োজনমতো সহযোগিতা না পেয়ে বিট, ফাঁড়ি ও ক্যাম্প পর্যায়ের বনকর্মীরা ক্ষেত্র বিশেষে বন রক্ষার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

৪.৩.২.৩ ‘মধুপুর-রসুলপুর ফায়ারিং রেঞ্জ’ কর্মীদের অবৈধ লিজ ‘বাণিজ্য’ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা: ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ সালে বিমানবাহিনীকে ফায়ারিং রেঞ্জ (‘মধুপুর-রসুলপুর ফায়ারিং রেঞ্জ’) প্রতিষ্ঠা করার জন্য বন ভূমির প্রায় ৩০৫ একর জমি দেওয়া হয়। বর্তমানে ৩০ থেকে ৩৫ একর জমি বিমানবাহিনীর কাজে ব্যবহার করা হলেও বাকী জমি বিধিবহির্ভূতভাবে হেক্টর প্রতি বছরে ৪ হাজার ৫০০ টাকা করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ) ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লিজ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩০৫ একর জমির অতিরিক্ত ২০ থেকে ২৫ একর বন বিভাগের জমি বিমানবাহিনীর স্থানীয় অফিস কর্তৃক দখল করে ও সীমানা চিহ্নি করার পর তা একই প্রক্রিয়ায় লিজ দেওয়া হচ্ছে। বনকর্মীদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় ফায়ারিং রেঞ্জ কর্মকর্তারা নিজেরা অবৈধভাবে সীমানা বাড়িয়ে নতুনভাবে খুঁটি গেড়ে বনের জমি দখল কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার অভিযোগ রয়েছে। লিজপ্রাপ্তরা পরে ফায়ারিং রেঞ্জ এড়িয়ার ভেতর ও বাইরের জমি স্থানীয়দের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা করে হেক্টর প্রতি সাব-লিজ প্রদান করে। কোনো বৈধ নথি ও প্রমাণাদি ছাড়া গোপনে লিজ দেওয়া। এসব জমিতে থাকা শালগাছের গোড়াসহ প্রাকৃতিকভাবে জন্ম হওয়া সকল গাছ, লতাপাতা ও আগাছা কেটে কলা, পেঁপে, আনারস, হলুদ ইত্যাদি আবাদ করা হয়। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয় ফায়ারিং রেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে অবৈধ লিজ দেওয়া বন্ধ করা ও সীমানার বাইরে বনের জমি দখল করে সীমানা খুঁটি না দেওয়া জন্য

---

[২৬৫] তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের একজন প্রাক্তন প্রধান বন সংরক্ষকসহ বনকর্মীদের একাংশ।

চিঠি দিলেও তা বন্ধ করা হয় নি, বরং নিজেরা সীমানা চিহ্নিত করে সরকারি বনের জমি লিজ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বনের জমি উদ্ধারে স্থানীয় ভূমি ও পুলিশ প্রশাসনসহ স্থানীয় বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে বলে বনকর্মীদের একাংশের অভিযোগ।

বক্স ২২

"বন বিভাগ ও অন্যান্য অফিসের মধ্যে নিয়মমাফিক চিঠি আদান-প্রদান করা হলেও বেদখল হওয়া বনের জমি উদ্ধারে স্থানীয় ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তারা তেমনটা তৎপর নন। ডিএফও অফিস শুধু দায়সারাভাবে ফায়ারিং রেঞ্জ কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি চালাচালি করেছে, কিন্তু দৃশ্যমান ও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। স্থানীয়দের অবৈধ দখল হতে বনের জমি উদ্ধার কিংবা দখল ঠেকাতে দিয়ে আমরা মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর এসব ঘটনারোধ করার জন্য বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে আমাদেরকে (অধস্তন বনকর্মী) শুধু ম্যানেজ করে চলার জন্য বলা হয়। আমাদেরকে ম্যানেজ করে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়। স্থানীয় দখলবাজদের সাথে মিলেমিশে থাকতে না পারলে অন্যত্র বদলি করা হয়।"- একজন রেঞ্জ কর্মকর্তার মন্তব্য (টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

৪.৩.২.৪ সরকারি বনের কাঠ অবৈধভাবে পরিবহনে সহায়তা: সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ ও কাঠ নৌযান বা ট্রাক দিয়ে পরিবহনের পথে বন বিভাগের স্থানীয় সংশ্লিষ্ট অফিস, যেমন- বন চেকপোস্ট, বিট, ফাঁড়ি, ক্যাম্প পার হতে হয়। পরিবহনকালে গাছ ও কাঠের ধরন ও পরিমাণ সম্বলিত নথি বনকর্মীদেরকে দেখাতে হয়। বনকর্মীদের একাংশ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশে ও নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা নিয়ে পরিবহনযানে বোঝাইকৃত গাছ ও ও পরীক্ষা করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে অনেকটা বিনাবাঁধায় ব্যবসায়ীরা সরকারি বনের গাছ অবৈধভাবে সংগ্রহ করার সুযোগ পান। ব্যবসায়ীরা সরকারি বন এলাকা পার হয়ে ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশের পথে সকল চেকপোস্ট (বন বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর) একই প্রক্রিয়ায় অতিক্রম করেন। একজন তথ্যদাতার মতে, পার্বত্য অঞ্চলে গাছ মোটরযান দ্বারা পরিবহনকালে স্থানীয় সকল সশস্ত্রদলগুলোতে টাকা দিতে হয়। উল্লেখ্য, এই পার্বত্য অঞ্চলে সক্রিয় সশস্ত্রদলগুলোর আয়ের প্রধান উৎস হলো সরকারি সংরক্ষিত বনের গাছ ও কাঠ। এছাড়া কিছু বন্যপ্রাণীও পাচারের সাথে পাহাড়ের সশস্ত্র বাহিনীগুলো জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে।[২৬৬]

৪.৩.২.৫ সামাজিক বনায়নের আড়ালে প্রাকৃতিক বন স্থায়ীভাবে উজাড় বা ধ্বংস: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, স্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশে বন কর্মীদের একাংশ সামাজিক বন কার্যক্রম ক্রমশন সম্প্রসারণ দ্বারা টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক বন তথা শালবন স্থায়ীভাবে ও ক্রমশ উজাড় হচ্ছে। সামাজিক বন সৃষ্টি করতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন প্রাকৃতিক বন ও বনের অবশিষ্ট গজারি গাছের মোথা পুরোপুরি উপড়ে ফেলছে। এভাবে সামাজিক বন সম্প্রসারণ দ্বারা কার্যত প্রাকৃতিক বন স্থায়ীভাবে উজাড় করা হচ্ছে। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলায় সামাজিক বনায়নের আওতায় লোক দেখানো কিছু আকাশমনি গাছ লাগানো হলেও সামাজিক বনায়নের আড়ালে লক্ষ্য থাকে অর্থকরী ফসল, যেমন- আনারস, কলা, পেপে, পেয়ারা, হলুদ ও আদা, ইত্যাদি আবাদ করা। উপকারভোগীরা সামাজিক বনায়নের প্লট নিজেদের মনে করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ ও নির্ধারিত প্লটের পার্শ্ববর্তী বনের গাছ ও বনের মাটি কেটে প্লটের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি করে। মধুপুর এলাকায় সামাজিক বন প্রাকৃতিক বন (শালবন) উজাড় ও বনের জমি পর্যায়ক্রমে দখল করার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বক্স ২৩

"সামাজিক বনায়নের লোভে স্থানীয় জনসাধারণ মধুপুর বনের প্রাকৃতিক গাছগুলো, যেমন- গজারি গাছ রাতের অন্ধকারে কেটে বন পরিষ্কার করে ফেলে। পরবর্তীতে বন বিভাগের লোকদেরকে সে জায়গাটি খালি দেখিয়ে সামাজিক বনায়নের জন্য আবেদন করে। এ প্রক্রিয়ার সাথে বন বিভাগের বন প্রহরী ও বিট কর্মকর্তাদের একাংশ জড়িত। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট শালবন টিকিয়ে রাখতে হলে অবিলম্বে সামাজিক বনের নামে বন বিভাগের জমি প্লট আকারে সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, কারণ বন ও বনের জমি দখলকারীদের কাছে সামাজিক বনায়ন একটি নিরাপদ পন্থা বা হাতিয়ার। সামাজিক বনের প্লট প্রস্তুত করতে গিয়ে শালগাছের চারা ও মোথাসহ ('কপিছ') সকল প্রজাতির ছোট-ছোট গাছ ও আগাছা কেটে ফেলা হয়। এরপর খালি জমিতে একলামশিয়া গাছ লাগানো হয়। এভাবে সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ দ্বারা শালবন ক্রমশ ধ্বংস হচ্ছে। এই প্রকল্প দ্বারা বনের প্লটের প্রাপক ও বনকর্মীদের একাংশ উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হয়। শালবনের গাছ উজাড় হওয়ার জন্য সামাজিক বনায়ন প্রকল্প অন্যতম সহায়ক বা কারণ।"- মাঠ পর্যায়ের একজন বনকর্মীর মন্তব্য

৪.৩.২.৬ রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে ও মাঠ পর্যায়ের বন কর্মকর্তাদের একাংশের সক্রিতার ঘাটতি: গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সার্কেল ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের একাংশ বনকেন্দ্রিক অনিয়মের সাথে নিজেরা জড়িত থাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের চাপের মুখে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সাহস পান না।

সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত গবেষণার আরো কিছু পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো:

---

[২৬৬] তথ্যসূত্র: একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের জাতীয় পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বন সাংবাদিক।

- সামাজিক বনায়নের সুবিধাভোগী হিসেবে কাগজে কলমে স্থানীয় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী হিসেবে নির্বাচন করা হলেও বাস্তবে স্থানীয় বাইরের বিত্তবান লোকদেরও সামাজিক বনায়নের নামে অনুমোদিত বনের জমিতে বিভিন্ন অর্থকরী ফসল আবাদ করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, শালবন এলাকার সামাজিক বনায়নের আওতায় প্রাপ্ত প্লট স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেরা বনায়ন কিংবা চাষাবাদ না করে অস্থানীয় ও অবস্থাসম্পন্নদের কাছে লীজ দিয়ে বছরে একটা নির্দিষ্ট টাকা নিয়ে নেয়। এভাবে প্রাপ্ত প্লটে অস্থানীয় ব্যক্তিরা কলা, পেঁপেঁ, আদা, আনারস ইত্যাদি চাষাবাদ করে থাকে। বছর শেষে নগদ টাকা পাওয়া যায় বলে সামাজিক বনায়নের প্রতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আগ্রহ কম। এ কারণে প্লটের শুরুতে লোক দেখানো কিছু গাছ লাগায়। এই চাড়াগুলো চার-পাঁচ হাত লম্বা হলে এর অধিকাংশই গোড়াসহ উপড়ে ফেলে হয়। মূলত এসব গাছ বড় হলে ফসলের ক্ষতি হবে বলে, সামাজিক বনায়নের জমিতে লাগানো গাছ কেটে ফেলা হয় এবং নামমাত্র কিছু গাছ রেখে দেওয়া হয়[২৬৭]।
- বনের ভেতরে কলা ও আনারস চাষ করার কারণে এগুলো পরিবহনের জন্য বনের গভীরে বড়-বড় ট্রাক নিয়ে যেতে হয়। এতে বন ভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয় ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

৪.৩.২.৭ পাহাড়ের বাঁশ চুরিতে সহায়তা: বাঁশকাটার পারমিট নিয়ে শুধু প্রাপ্ত বয়স্ক বাঁশ কাটার কথা থাকলেও ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বনকর্মী, গাছচোর, সশস্ত্রদলের কর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা তথা যোগসাজশে সরকারি বন ও জোতের সকল বাঁশ নির্বিচারে কেটে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সরকারি পাহাড়ের বাঁশ স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাধীন বনের বাঁশ হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩.২.৮ লোকদেখানো অবৈধ বনজসম্পদ উদ্ধার তৎপরতা: বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে বিশেষ করে রেঞ্জ ও বিট অফিসে সরকারি বনের গাছ ও কাঠের স্তুপ দেখা যায়। সাধারণ পর্যবেক্ষণে তা বন অধিদপ্তর কর্তৃক জব্দ ও উদ্ধারকৃত বনজ সম্পদ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ উদ্ধার তৎপরতা মূলত লোক দেখানো ও সাজানো, যাতে মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে বনকর্মীরা সরকারি বন রক্ষায় তৎপর।

> **বক্স ২৪**
>
> "বন অধিদপ্তরের কর্মীদের অবৈধভাবে কাটা কাঠ ও গাছ উদ্ধার তৎপরতা আসলে লোকদেখানো ঘটনা মাত্র। এর দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সরকারকে বুঝানো যাবে যে বনকর্মীরা বিনা অনুমোতিতে কাটা গাছ, কাঠ উদ্ধার ও জব্দ করতে সদা তৎপর। তবে বাস্তবে বনকর্মীদের সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে এর বহুগুণ গাছ ও কাঠ পাচার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বনকর্মীদের যোগসাজশে সরকারি বন হতে অবৈধভাবে কাটা গাছের ছোট চোট চালানসহ ব্যবসায়ীরা ধরা দেয়। আর ঘুষ নিয়ে বড় বড় চালান পার করে দেয়। এটা অনেকটা বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালনা প্রক্রিয়ার মতো, যেখানে বড় বড় লট পার করার জন্য মাঝে মধ্যে ছোট ছোট লট ধরা পড়ার সাজানো নাটক সাজানো হয়।"- মাঠ পর্যায়ের একজন বনকর্মীর মন্তব্য

দুর্গম পাহাড়ী এলাকার সংরক্ষিত বনের গাছ অবৈধভাবে কাটার ঘটনা সাধারণ মানুষের নজরে আসে না। বনকর্মীদের একাংশ ও কাঠ ব্যবসায়ী বা গাছচোরদের মধ্যে সমঝোতায় এসব হয়ে থাকে। তবে অবৈধভাবে কাটা গাছ পাচারের ঘটনা স্থানীয় মানুষের নজরে এলে এবং তা অভিযোগ আকারে বন অফিসকে অবহিত করা হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানীয় বন অফিস তা আটক ও উদ্ধারের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। বন বিভাগের কোনো দল ঘটনাস্থলে পৌঁছার পূর্বেই গাছ কাটার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন বনকর্মীদের একাংশের নির্দেশনা মোতাবেক ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এলাকার কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন বন বা জোত হতে কিছু গাছ কেটে এনে রাখা রাখা হয়। এরপর উদ্ধারকৃত গাছ স্থানীয় বন অফিস প্রাঙ্গনে কয়েক মাস ও ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক বছর রেখে দেওয়া হয়।[২৬৮]

৪.৩.৩ যোগসাজশ

৪.৩.৩.১ সরকারি বন উজাড় ও বনের জমি বেদখলে সম্পৃক্ততা: টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত শালবন এলাকার বনভূমি উজাড় ও বনের জমি বেদখল হওয়ার ঘটনার সাথে বন বিভাগের কর্মীদের একাংশের সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন বিভাগের কর্মীদের একাংশের সাথে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করে শালবনের ভেতরে বা বন বিভাগের গাছশূন্য জমিতে প্রভাবশালীরা স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে অবৈধভাবে স্থাপনা তথা বাড়িঘর, বিনোদন কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপনা গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে। বনের জমি অবৈধভাবে দখলের দায়ের সংশ্লিষ্ট দখলকারীর বিরুদ্ধে কোন ধারায় মামলা করবে এবং মামলার তদন্ত প্রতিবেদন কীভাবে তৈরি করা হবে তাও বন মামলার বাদীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করা হয় বলে তথ্য রয়েছে। একই কারণে বন বিভাগ বন মামলায় হেরে যাওয়ার পাশাপাশি মামলাগুলো অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।

৪.৩.৩.২ বনকর্মীদের একাংশের সংশ্লিষ্টতায় বন উজাড়: স্থানীয় সাধারণ মানুষ এতো শক্তিশালী নয় যে তারা নিজেরা সরকারি বনের গাছ উজাড় ও বনের জমি দখল করতে পারবে। স্থানীয় বন বিভাগ ও অন্যান্য প্রশাসন এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে বিধায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী

---

[২৬৭] তথ্যসূত্র: স্থানীয় এনজিও কর্মী, বন গবেষক ও বর্তমান গবেষক দল।

[২৬৮] তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তরের কর্মী ও সংবাদকর্মী।

ও বহিরাগত প্রভাবশালীরা বন ও বন বিভাগের জমি দখল করার সুযোগ পায়। মূলত রেঞ্জ ও বিট কর্মীদের একাংশ বিধিবহির্ভূত টাকার বিনিময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে বিট অফিসারদের একটি চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা একেক দিন একেকটি এলাকা ফাঁকা করার জন্য টার্গেট করে, যেমন- পূর্বে চাড়ানজানি বিট অফিসের পাশে বন ছিল কিন্তু এখন পরিষ্কার। ফুলবাড়িয়া লুহুরিয়া বিট অফিসের কাছে বানর হনুমান ছুটোছুটি করতে দেখা যায়, কারণ বনের ভেতরে কোনো খাবার নেই। বনরক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয় একজন এনজিও কর্মীর মতে, "যারা নিজের অফিসের পাশের সম্পদ রক্ষা করতে পারে না, তারা কীভাবে বন রক্ষা করবে? বন কর্মকর্তারা চাইলে একটি গাছও কেউ অবৈধভাবে কাটার সাহস করবে না।"

৪.৩.৩.৩ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের বন উজাড়ে সহযোগিতা: প্রাপ্ত তথ্য মতে, তিনটি চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহে সক্রিয় সশস্ত্র দলগুলোর আয়ের অন্যতম উৎস হলো সরকারি বনজ সম্পদ। সশস্ত্র দলগুলো গভীর বনে থাকা বিরল, মূল্যবান ও সঙ্কটাপন্ন প্রজাতির গাছ গাছ চোর ও জোত পারমিটপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদেরকে চিনিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তা নির্বিঘ্নে কেটে ও পরিবহন করে বনের বাইরে আনার বন্দোবস্ত করে দেয়। ব্যবসায়ীদের নিকট হতে বিধিবহির্ভূত অর্থ নিয়ে এসব ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় বনকর্মীদের একাংশ কার্যত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না কিংবা এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তারা তাদের দায় সশস্ত্র দলগুলো ও পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গমতার অযুহাত দিয়ে বনকর্মীদের একাংমের দায়িত্ব অবহেলা ও সংশ্লিষ্টতার ঘটনা এড়িয়ে যান।

৪.৩.৩.৪ বদলির আদেশ অপব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের দ্বারা কাঠ পাচারে সহযোগিতা: বন উজাড় ও কাঠ পাচারের জন্য পরোক্ষভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশ দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা থেকে দেশের অন্যত্র বদলির সময়ে বদলির চিঠি (অর্ডার) দেখিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে কাঠ ব্যবসায়ীদের দ্বারা আসবাবপত্র তৈরি করে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, বাসা স্থানান্তরের জন্য বদলির চিঠির সাথে নিজ পরিবারে ব্যবহার্য আসবাবপত্রের একটি তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়। বাস্তবে কাঠ ব্যবসায়ীদের একাংশ পার্বত্য এলাকা হতে কোনো সরকারি কর্মী দেশের অন্যত্র বদলি হওয়ার সংবাদ শুনে বদলির আদেশ পাওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যবহার্য আসবাবপত্রের নতুন ফার্নিচারের নাম ঢুকিয়ে দেন যা তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। এর বিনিময়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিয়ে উক্ত সরকারি কর্মীকে রাজী করানো হয়।

৪.৩.৩.৫ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিধিবহির্ভূত সুবিধা দিয়ে দুর্নীতির ঘটনা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা: স্থানীয় সাংবাদিকদের একাংশের সাথে বনকর্মী, কাঠ ও ফার্ণিচার ব্যবসায়ী ও গাছ পাচারকারীদের মধ্যে একটি অলিখিত সমঝোতা বিদ্যমান। স্থানীয় কাঠ ও কাঠের আসবাপত্র ব্যবসায়ীরা স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদেরকে 'মাসিক মাসোহারা' বা বিশেষ সুবিধা, যেমন- মাসিক নগদ অর্থ প্রদান, বিদেশ ভ্রমণের খরচ, ইত্যাদি প্রদান করে সরকারি বনের গাছ উজাড় ও বনভূমি দখল কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। 'রিসোর্সফুল' এলাকায় কর্মরত বনকর্মীরা বন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার না করার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদেরকে মাসিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করেন। এভাবে কাঠ ব্যবসায়ী ও বনকর্মীদের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা নিয়ে জোত পারমিটের আড়ালে সরকারি সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ অবৈধভাবে উজাড় ও বনের জমি বেহাত হওয়ার ঘটনার ওপর প্রতিবেদন তৈরি ও তা প্রকাশ কিংবা প্রচার করা থেকে বিরত থাকে।[২৬৯]

বক্স ২৫

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের কোনো কোনো সাংবাদিক সরকারি বনের গাছ চোর, কাঠ পাচারকারী ও আসবাপত্র ব্যবসায়ীদের টাকায় বছরে এক থেকে দু'বার বিদেশে আনন্দ ভ্রমণে যান। এর বিনিময়ে উক্ত সাংবাদিকরা বন অপরাধীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার নিউজ করা থেকে বিরত থাকেন।" - চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি বন উজাড় বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধ্যান-ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এমন একজন সাংবাদিকের মন্তব্য

৪.৩.৪ নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

৪.৩.৪.১ অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বাধা না দেওয়া ও তা উচ্ছেদ না করা: গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট রেঞ্জের শালনা বিট এলাকায় সরকারি সংরক্ষিত বনের জমিতে প্রায় তিন শতাধিক পরিবার বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে। এসব পরিবারকে উচ্ছেদ করতে বনকর্মীদের কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। বনের জমি হতে বাড়িঘর সরিয়ে নেওয়ার জন্য বন বিভাগের পক্ষ হতে কখনো চাপ সৃষ্টি করা হয় নি বলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বনের জমিতে অবৈধভাবে বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাসীদের একাংশ অবহিত করেছেন। ঘর বা বাড়ি নির্মাণ করতে চাইলে স্থানীয় দালাল বা সোর্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার বনকর্মীর দাবি মোতাবেক টাকা দিলে কোনো প্রকার অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ২৬

[২৬৯] তথ্যসূত্র: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের একাংশের অভিমত।

"বনের জমি রক্ষায় বনের লোকদের (কর্মীদের) আগ্রহ নেই। যেকেউ শালনা বিট এলাকার গাছশূন্য সরকারি বনের জমিতে টাকা দিয়ে ঘর বা স্থাপনা নির্মাণ করতে পারে। আমি একটি টিনের ঘর তোলার সময় স্থানীয় বন অফিসের লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আমার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এর অন্যথা হলে ঘর ভেঙ্গে ফেলা হবে কিংবা বন মামলার আসামি করার হুমকি প্রদান করেন। এমতাবস্থায় দাবি মোতাবেক টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করি। এই টাকা স্থানীয় দালালের মাধ্যমে পরিশোধ করেছি।"- শালনা বিটের জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাসরত একজনের মন্তব্য

৪.৩.৪.২ বনের জমি বেদখল হতে সহায়তা বা সুযোগ করা: বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বন বিভাগের জমি প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদেরকে দখলের সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তাদেরকে সহায়তা করেন সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জার ও বিট কর্মকর্তাদের একাংশ। সরকারি বনের জমি বন কর্মকর্তাদের একাংশের সহযোগিতায় প্রভাবশালীদের দ্বারা দখল হওয়ার ক্ষেত্রে জমি উদ্ধারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নেওয়া কিংবা এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও তা আমলে না নেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল ধারায় মামলা দায়ের, দায়সারাভাবে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন বা চার্জসিট তৈরি ও দায়সারাভাবে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা, ইত্যাদি উদাহরণ রয়েছে। এভাবে বনকর্মীদের একাংশ স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, জনপ্রতিনিধি ও ভূমির দালাল গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার আওতাভুক্ত শালবন উজাড় ও বনভূমির জমি দেখল হওয়ার সাথে জড়িত হন। বনকর্মী ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশ বাইরের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা নিয়ে সরকারি বনের জায়গা দখল করতে সহযোগিতা প্রদান করে।

বক্স ২৭

"বনের কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জমি প্রভাবশালী কোনো শিল্পপতির নজরে এলে স্থানীয় কোনো দালালের সহায়তায় প্রথমে বন সংলগ্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ক্রয় করা হয়। এরপর শিল্পপতিদের পক্ষে ক্রয়কৃত জমির পার্শ্ববর্তী বনের জমির অংশ বিশেষের জন্য নকল দলিল তৈরি করার পাশাপাশি তা দখল করা হয়। নকল দলিল তৈরিতে বিধি-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, তহশিল অফিস এসি ল্যান্ড অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ সহায়তা প্রদান করেন। ভূয়া দলিল তৈরি করে তা দখল করার পাশাপাশি ক্রয় ও দখলকৃত জমির আশে-পাশের থাকা বন বিভাগের জমিও পর্যায়ক্রমে দখল করা হয়। সরকারি বনের জমি বেদখল হওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার হতে বিরত রাখতে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়, রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ের কার্যালয়ের বন কর্মকর্তাদের একাংশও বিধিবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা নিয়ে বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারের জন্য কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা প্রশাসনও (পুলিশসহ) প্রভাবশালী কর্তৃক দখলকৃত বনভূমির জমি উদ্ধারে তেমন উৎসাহী নয়।"- একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য (টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

৪.৩.৪.৩ বনের জমি নিয়ে 'লিজ বাণিজ্য' ও বন উজাড় ত্বরান্বিত করা[২৭০]: ঢাকা ও টাঙ্গাইল বন বিভাগীয় এলাকায় বন বিভাগের জমিতে অর্থকরী ফসল, যেমন- কলা, আনারস, পেঁপে, হলুদ, আদা, কচু, ইত্যাদি, আবাদের সুযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে বন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক বছর-ভিত্তিক টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় এসব এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণের একাংশ সরকারি বনের বৃক্ষ উজাড় হওয়া জমি বা বনের অভ্যন্তরে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির পার্শ্ববর্তী বনভূমির গাছ ক্রমশ কেটে চাষাবাদ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হয়। মূলত বনকর্মীদের একাংশ বনের জমি স্থানীয় জনসাধারণ ও বাইরের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ব্যবসায়ী ও কোম্পানিকে অলিখিত লিজ দিয়ে বা ভূমি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে নিজেরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় অ-আনুষ্ঠানিকভাবে লিজ প্রদানকৃত জমির পার্শ্ববর্তী বন ক্রমশ গাছশূন্য করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সরকারি বনভূমির জমি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় বন বিভাগের কর্মী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলীয় স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশ লিজ গ্রহিতা নির্বাচনে তথা নির্দিষ্ট লিজ গ্রহিতাদেরকে বনের জমি পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটক ও প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। লিজ গ্রহিতার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের বাইরেও নিজেদের লোকজনকে প্লট পাওয়ার জন্য বন বিভাগকে রাজী করায়। আবার এ সকল রাজনৈতিক নেতাদের আত্মীয়-স্বজনের নামেও নিজেরা প্লট লিজ নিয়ে অর্থকরী ফসল আবাদ করে।

৪.৩.৪.৪ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য বিনষ্টে সম্পৃক্ততার অভিযোগ: সুন্দরবন সংরক্ষিত বন হওয়ায় এতে সর্বসাধারণের বিনা অনুমতিতে প্রবেশাধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত। মাছ ধরাসহ কাঁকড়া, চিংড়িপোনা, মধু, গোলপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সুন্দরবনের ভেতরে প্রবেশের জন্য স্থানীয় বন অফিস থেকে পারমিট তথা লিখিত অনুমোতি প্রয়োজন হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পারমিট নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের একাংশ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে থাকা খাল ও নদীতে বিষ প্রয়োগ করায় নির্দিষ্ট ধরনের মাছের পাশাপাশি অন্যসব প্রজাতির মাছের রেনু বা পোনা মরে যায়। এতে করে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে থাকা নদ-নদীতে থাকা মৎস্য সম্পদের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জেলেরা বন বিভাগের কর্মীদের একাংশকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় মাছ শিকার করার সুযোগ করে নেন।

[২৭০] তথ্যসূত্র: স্থানীয় এনজিও কর্মী, বন গবেষক ও বর্তমান গবেষক দল।

৪.৩.৪.৫ ডিএফও-রেঞ্জারদের একাংশের মধ্যে বিধিবহির্ভূত লেনদেনের অভিযোগ: ফরেস্ট রেঞ্জারদের সাথে ডিএফওদের কখনো বিরোধ বাধার ঘটনা বিরল। রেঞ্জ কর্মকর্তাদের একাংশ মূলত বিট, ফাঁড়ি ও চেকপোস্ট হতে টাকা সংগ্রহ করে ডিএফওকে প্রদান করেন। এ টাকার একটা অংশ রেঞ্জাররা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে রেঞ্জারদের একাংশ ক্ষেত্র বিশেষে ডিএফওদের একাংশের 'ক্যাশিয়ার' হিসেবে কাজ করেন। এ কারণে ডিএফও ও রেঞ্জ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধের ঘটনা বিরল।

৪.৩.৪.৬ সামাজিক বন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪.৩.৪.৬.১ আর্থিক অনিয়মের সুযোগ থাকায় সামাজিক বনায়নে বেশি আগ্রহ: উজাড় হওয়া বশাল গাছের কপিছ/চাড়া রক্ষা করে বন ফিরিয়ে আনার জন্য বনকর্মীদের কোনো আগ্রহ নেই, কারণ এতে তাদের তেমন কোনো লাভ নেই। একজন বনকর্মী একটি এলাকায় দুই-তিন বছরের জন্য বদলি হয়ে আসেন, সামাজিক বনায়নের মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ বিদ্যমান। সামাজিক বনের জন্য চারা উৎপাদন, বাগান তৈরি, সুবিধাভোগী বাছাই, গাছ লাগানো, মেয়াদ শেষে গাছ কাটার জন্য গাছের পরিমাপ, ইত্যাদি কাজে বনকর্মীদের বিধিবহির্ভূত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। এসব কারণে বনকর্মীদের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রতি বেশি নজর।

> বক্স ২৮
>
> "স্থানীয় বন প্রশাসন, স্থানীয় বননেতা, বন বিভাগ, রাজনৈতিক বিভাগ এবং উপজেলা প্রশাসন মিলে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে জোড়ালো যুক্তি দিয়ে ঊর্ধ্বতন বন কর্তৃপক্ষকে রাজী করিয়ে কার্যত বনভূমি উজাড় করছে।"- একজন এনজিও প্রতিনিধি ও সামাজিক বনায়নের সুবিধাভোগীর মন্তব্য

৪.৩.৪.৬.২ প্রকৃত ভূমিহীনদের সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত না করা: সামাজিক বনায়নের মূল সুবিধাভোগী হওয়ার কথা স্থানীয় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর। বন বিভাগের নথিপত্রে ভূমিহীনদের নামে এই প্লট বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বা বহিরাগত প্রভাবশালীরা আসল সুবিধাভোগী। বনকর্মীদের একাংশ নিজেদের ইচ্ছামাফিক সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করার অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালীরা বনকর্মীদের একাংশকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিয়ে স্থানীয় ভূমিহীনদের নামে প্লট বরাদ্দ নিয়ে থাকেন। প্লট প্রতি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা দিতে হয়। একবার সামাজিক বন করার জন্য প্লট পেলে সামাজিক বনায়নের নাম করে কলা, পেঁপে, আনারস, হলুদ ইত্যাদি আবাদ করে এবং পরবর্তী প্লটের আশেপাশে থাকা বন ও বনভূমির জমি ক্রমশ দখল করতে থাকে।

৪.৩.৪.৬.৩ সামাজিক বনায়নের প্লট বরাদ্দে ঘুষ লেনদেন: বন বিভাগ হতে সামাজিক বনায়নের স্থানীয় জনসাধারণের কাছে প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ প্লটের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশ প্লট তদ্বির করে ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট কাউকে প্লট পাইয়ে দেন। একটি প্লটের বিপরীতে ১০ থেকে ১৫টি নাম থাকলেও বাস্তবে মূল মালিক একজন। বনকর্মীদের সাথে আঁতাত করে স্থানীয় কিছু ভূমিহীন মানুষের না সামাজিক বনের জন্য বরাদ্দকৃত প্লটের সুবিধাভোগীর তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় সুবিধাভোগীদের তালিকায় যাদের না থাকে তাদের অনেকে জানে না তারা নির্দিষ্ট কোন প্লটের সুবিধাভোগী।

৪.৩.৪.৬.৪ লিজ প্রদান আর্থিক সুবিধা গ্রহণ: গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি বন ও বনের জমি বেদখল হওয়া হতে রক্ষার পক্ষে যুক্তি দিয়ে স্থানীয় বন কর্মকর্তারা সরকারি বনের জমিতে সামাজিক বনায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন বন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানায়। অনুমতি পাওয়ার পর বনের জমি প্লট আকারে স্থানীয় ও বাইরের প্রভাবশালীদের মধ্যে তা বন্টণ করা হয়। প্রভাবশালীরা তা স্থানীয় মানুষে কাছে অলিখিতভাবে লিজ প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় প্লটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট বনকর্মীরা আর্থিকভাবে লাভবান হন। প্রতি হেক্টরের প্লটের জন্য বনবিভাগের কর্মীরা ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ হিসেবে পেয়ে থাকেন। একটি প্লট তিন থেকে চার বছর চাষ করার সুযোগ পায় লিজ মালিক। লিজ নিয়ে প্লটে থাকা সকল গাছ (বিশেষ করে শালগাছ) ও গাছের গোড়া, চারা ও মোথাসহ ('কপিছ') কেটে ও আগাছা পরিষ্কার করে কলা, আদা, কঁচু ও আনারস, ইত্যাদি আবাদ করা হয়।

৪.৩.৪.৬.৫ বন মামলা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ: বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনবাসীদের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার ভুয়া মামলা দায়েরের অভিযোগ রয়েছে। বনকর্মীদের একাংশ সংশ্লিষ্ট কাঠচোর/ব্যবসায়ীর সাথে যোগসাজশে এমনভাবে মামলা দায়ের করে যাতে প্রকৃত কাঠচোর/ব্যবসায়ীকে সনাক্ত করা যায় না। এছাড়া বিধিবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা নিয়ে ভুল মামলা দায়েরসহ এমনভাবে মামলা দায়ের করা যাতে বনের জমি আর ফেরৎ পাওয়া না যায়।

৪.৩.৪.৬.৬ তথ্য গোপন: সামাজিক বনের মেয়াদউত্তীর্ণ গাছ দরপত্রে বিক্রির পর বাগান হতে গাছ কেটে নেওয়ার পর কত টাকায় গাছ বিক্রি করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীরা তাদের প্রাপ্য অংশ পাবেন তা অবহিত না করার তথ্য উদাহরণ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যেমতে, ঢাকা বন বিভাগের আওতাভুক্ত রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট রেঞ্জের সামাজিক বনায়ন প্রকল্পভুক্ত একটি প্লট। এর ১৭ জন উপকারভোগী নির্বাচনে জনপ্রতি পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। একলাশিয়া জাতীয় গাছ লাগানোর তেরো বছর পর গাছ কাটার জন্য দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। গাছ কাটার পূর্বে গাছের তালিকা তৈরি, নম্বর দেওয়া ইত্যাদি কাজের কথা বলে স্থানীয় বনকর্মীরা উপকারভোগীদের নিকট হতে জনপ্রতি ছয় হাজার টাকা আদায় করেন। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঠিকাদার উক্ত বনের অধিকাংশ গাছ কেটে নিয়ে গেলেও ঠিক কত টাকায় সব গাছ

বন বিভাগ বিক্রি করেছে, সদস্যরা কয় টাকা করে পাবেন, কবে তা দেওয়া হবে তা জানানো হয় নি। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জারকে ফোন করে জানা যায় শালনা বিটের ২৮ নম্বর প্লটটি দরপত্রে দুই লক্ষ ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

৪.৪ মাঠ পর্যায়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

৪.৪.১ অফিস পরিচালন ব্যয়ের অর্থ আত্মসাৎ

বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ করে ডিএফওরা নিজেরাদের কার্যালয়ে প্রায় পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও তাদের অধীনস্ত কার্যালয়গুলোর বিষয়ে মনোযোগী নন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিট, ফাঁড়ি ও ক্যাম্প ইত্যাদি কার্যালয়ের জন্য কী কী প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক চাহিদা আকারে ও লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কার্যালয়কে জানানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রেঞ্জ অফিসগুলো অধস্তন অফিসগুলোর আর্থিক চাহিদা ডিএফও অফিস বরাবর পাঠিয়ে থাকে। তবে বিট ও এর নীচের কার্যালয়গুলোর অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার বাবাদ বরাদ্দ বা ব্যয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসে কিনা কিংবা তা আসলেও কী পরিমাণ বরাদ্দ আসে সে বিষয়ে এসব কার্যালয়ে কর্মরত কর্মীদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ক্ষেত্র বিশেষে চাহিদার বিপরীতে বরাদ্দ না আসার কারণ বনকর্মীদের জানানো হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বরাদ্দ আসলেও তা বিট অফিসে পৌঁছায় না বলে তথ্য পাওয়া যায়।

বক্স ২৯

"আমার (বিট) অফিস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারিভাবে প্রতিবছর কোনো বরাদ্দ আসে কি-না তা আমি জানি না। বিট কার্যালয়ের জন্য প্রতিবছর কী কী বরাদ্দ আসে তা ডিএফও ও রেঞ্জ কার্যালয় হতে জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। জরুরি প্রয়োজনে কিছু মেরামত করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে তা করি। ডিএফওদের কাছে কোনো বিট কর্মকর্তা কখনো সাহস করে তা জানতে চায় না।"- একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য (টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

এছাড়া প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিট ও এর নীচের কার্যালয়গুলোর অফিস রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন বাবদ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়ার পর উক্ত কার্যালয়ের হিসাব শাখা বিলের টাকা উত্তোলনের পর টাকা টাকার পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৪.২ বনকর্মীদের মাসিক বেতন-ভাতা ও বিলের একাংশ কেটে রাখা

বিট, ক্যাম্প, ফাড়িঁসহ সমমান পর্যায়ে কার্যালয়ে কর্মরত বনকর্মী তথা বিট অফিসার ও এর নীচের সকল কর্মীদের মাসিক বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কার্যালয়ের অধীনস্ত একজন ফরেস্ট রেঞ্জারের মাধ্যমে নগদ ও চেকে প্রদান করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বনকর্মীরা বেতন-ভাতার পুরো অংশ পান না, কারণ রেঞ্জ ও ডিএফও অফিসের মাসিক খরচের কথা বলে মাসিক বেতনের একটি অংশ কেটে রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলসহ তিনটি পার্বত্য জেলার অধিকাংশ বিট ও চেক স্টেশন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কার্যালয়ের খরচ বাবদ মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এছাড়া ভ্রমণ বিলসহ সকল প্রকার বিলের টাকা তুলতে গেলে মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের নিকট হতে বিভাগীয় বন কার্যালয়ের হিসাব শাখা কর্তৃক প্রতিবার জনপ্রতি দু'শো থেকে পাঁচশত টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এভাবে টাকা না দিলে বনকর্মীদেরকে বিভাগীয় বন কার্যালয়ে অযথা বসিয়ে রাখা হয়।

বক্স ৩০

"রেঞ্জ কর্মকর্তাকে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। কিন্তু কীভাবে ও কোথা থেকে তা যোগাড় করবো তা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেন, আমাকে ডিএফও অফিসে টাকা দিতে হবে, যেভাবে পারেন ম্যানেজ করে দিবেন। এমতাবস্থায় আমাদের কেউ-কেউ বাধ্য হয়ে গাছচোর ও ভূমিদস্যুদের সাথে মিলে উক্ত টাকা যোগাড় করে। এভাবে কর্মকর্তারাই আমাদেরকে বন উজাড়ের ঘটনায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেন।"- একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য

"বিট কর্মকর্তা ও ফরেস্ট রেঞ্জারসহ মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীরা বিভিন্ন বিলের টাকা তুলতে এসে খুশি হয়ে কিংবা কিংবা চা নাস্তা খাওয়ার জন্য আমাদেরকে তাদের ইচ্ছামাফিক কিছু টাকা দেন। এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে কোনো চাপ সৃষ্টি করি না।"- বনকর্মীদের বিলের টাকা উত্তোলনের পর নগদ অর্থ কেটে রাখা প্রসঙ্গে এটি ডিএফও কার্যালয়ের হিসাব শাখার কর্মীর মন্তব্য

৪.৪.৩ বনায়ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বনায়ন প্রকল্পের অর্থ প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি ডিএফও এর দপ্তরের বাংক হিসাবে পাঠানো হয়। ডিএফও দপ্তর প্রথমে বনায়ন প্রকল্প এলাকা সংশ্লিষ্ট বিটগুলোর বিপরীতে চেক ইস্যু করে এবং সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করানো হয়। এরপর ডিএফও নিজে বা তার দপ্তরের হিসাব কর্মীরা উত্তোলিত টাকার এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত 'ডিএফও এর অফিস খরচ' বাবদ রেখে/কেটে রাখেন, কিন্তু উক্ত টাকার বিপরীতে কোনো রশিদ/নথি প্রদান করেন না।

৪.৪.৪ পরিবহন যান বাবদ বরাদ্দের টাকা কেটে রাখা

ডিএফও অফিসের সকল প্রকার মোটরযানের (ইঞ্জিনবোটসহ) বিল ও বরাদ্দের একটা অংশ কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে। তবে নথিপত্র হতে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বনকর্মীদের নিকট হতে পুরো বিলের নথিতে প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, একজন বিট কর্মকর্তা একটি সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য মোটরসাইকেলের জন্য মাসিক বরাদ্দ পাঁচ হাজার টাকা বুঝে পেয়েছি বলে ভাউচারে স্বাক্ষর দিলেও বাস্তবে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা পান। ডিএফও অফিসের হিসাব শাখা এই টাকা কেটে রাখে। এছাড়া জ্বালানি ব্যয় বাবদ ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবে ১০ থেকে পনেরো ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

বক্স ৩১

"মোটরসাইকেলের জ্বালানি বাবদ আমার জন্য কত টাকা বরাদ্দ এসেছে ডিএফও ও রেঞ্জ অফিসে তা জানার চেষ্টা করলে অন্য কোনো বিপদে (যেমন- দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাস্তিমূলক বদলি) পড়ার ঝুঁকি থাকে বলে আমরা তা এড়িয়ে যাই।"- একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য

৪.৪.৫ বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের বিল ছাড়ে অনিয়ম

বনায়ন কার্যক্রমে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। একটি এক হেক্টর আয়তন-বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টির জন্য নার্সারী ও চারা তৈরি, আগাছা পরিষ্কার ও চারা লাগানোর জন্য সর্বমোট ২২ হাজার পাঁচশত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে ডিএফও অফিস কর্তৃক অভ্যন্তরীণ খরচের কথা বলে উক্ত টাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বনকর্মী পুরো টাকা পেয়েছেন বলে নথিতে স্বাক্ষর দিতে হয়।

বক্স ৩২

"বিভাগীয় বন কার্যালয়ের হিসাব শাখায় বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দশ লক্ষ টাকার একটি বিলের অর্থ বুঝিয়া পেয়েছি- এই মর্মে স্বাক্ষর দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর এক তৃতীয়াংশ পাই। ডিএফও অফিসের খরচ বলে এই টাকা কেটে রাখা হয়। অপ্রত্যাশিত ও দুর্গম এলাকায় বদলিসহ চাকরি ক্ষেত্রে হয়রানীর শিকার হওয়ার ভয়ে আমরা এসব বিষয়ে জোরালো কোনো প্রতিবাদ করা কিংবা উচ্চ পর্যায়ে অভিযোগ দিতে সাহস পাই না।"- একজন বিট কর্মকর্তার মন্তব্য

৪.৪.৬ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয়ে অনিয়ম

সরকারি ক্রয় আইন মোতাবেক বন প্রকল্পের প্রস্তাবনায় ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করার বিধান থাকলেও মাট পর্যায়ের বিভাগীয় অফিসগুলো ক্ষেত্র বিশেষে ইচ্ছাকৃতভাবে তা অনুসরণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ঠিকাদারের যোগ্যতা লক্ষ রেখে দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় যাতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় মোতাবেক নির্দিষ্ট কোনো একটি ভেণ্ডর যোগ্যতাপূরণ সাপেক্ষে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করার পাশাপাশি কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্মকর্তা ও ভেণ্ডরের মধ্যে আর্থিক ও সুযোগ-সুবিধা, যেমন- বিদেশ ভ্রমণ, বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২৭১]

৪.৫ সরকারি বন উজাড়ের ঘটনায় যারা সম্পৃক্ত

৪.৫.১.১ বন অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশ: প্রাপ্ত তথ্য মতে, বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশ ছাড়া বনের জমি কারো পক্ষে বনভূমি দখল করা সম্ভব নয়, কারণ স্থানীয় বন অফিস ও এর কর্মীরা এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধ করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি গাছ কাটে তবে সে একটি কাটতে পারে, কিন্তু ৪০ থেকে ৫০টি গাছ কাটলে সংশ্লিষ্ট বিট, ক্যাম্প ও ফাঁড়িতে কর্মরত বনকর্মীদের একাংশসহ কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কাদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়ে বন অপরাধ সংগঠিত হয়। বন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক অধস্তন বনকর্মীদের নিয়ম-বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়।

বক্স ৩৩

"গাছ চোরেরা মূল অপরাধী নয়, আমরাই (বনকর্মী) তাদেরকে বন উজাড়ের জন্য সুযোগ করে দিই। এর বিনিময়ে আমরা তাদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাই।"- টাঙ্গাইল বন বিভাগের একজন বনকর্মীর মন্তব্য

"বিভাগীয় ও রেঞ্জ পর্যায়ের কর্মকর্তারা আমাদেরকে মাঠ পর্যায়ে সবকিছু ম্যানেজ করে চলতে বলা হয়। বনের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও বেদখল হওয়া জমি ও অবৈধভাবে কাটা গাছ উদ্ধার করে স্থানীয় বন অফিসে নিয়ে আসা, ইত্যাদি কাজের জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন।"- একজন রেঞ্জ কর্মকর্তার মন্তব্য

৪.৫.২ কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার (সিএফডব্লিউ) দ্বারা বন উজাড়: মধুপরের শালবন এলাকায় বন রক্ষার জন্য কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার (সিএফডব্লিউ) নিয়োগ দেওয়া হয়। এরা একসময় বনদস্যু হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদেরকে দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দৈনিক ভাতাসহ (৭০০ টাকা) বন পাহাড়া দেওয়ার জন্য ড্রেস, টুপি, জুতো ও ছাতা দেওয়া হয়। সিএফডব্লিউদের প্রশিক্ষণ

[২৭১] তথ্যসূত্র: আইএমইডি'র একজন কর্মকর্তার অভিমত।

দেওয়া হলেও তাদের একাংশের অভ্যাস পরিবর্তন হয় না। সিএফডব্লিউদের একাংশ সরকারি বনের গাছ কাটে কিংবা বনের জমি দখল করে ফসল আবাদ করে।[২৭২]

৪.৫.৩ অন্যান্য অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা: সরকারি বনের জমি অবৈধভাবে দখলের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের তহশিলদার, এসি ল্যান্ড, জেলা রেকর্ড রুমের কর্মচারী, জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ভূমি সংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তি দুই নম্বর খতিয়ানভুক্ত তথা বন বিভাগের জমিকে এক নম্বর খতিয়ানে (খাসজমি) অন্তর্ভুক্ত করাসহ বনের জমি দখলকারীদের পক্ষে ভুয়া দলিল তৈরি করা, জেলা ও কেন্দ্রিয় রেকর্ড রুম থেকে নির্দিষ্ট জমির রেকর্ডের পাতা ছিঁড়ে ফেলা ও দাগ নম্বর নষ্ট করা, ইত্যাদি কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৬ বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও ট্রাস্টফাণ্ড প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

৪.৬.১ অপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ

বন অধিদপ্তরের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণত মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকদের একাংশের রাজনৈতিক স্বার্থে ও ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে দ্রুততার সাথে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প আসলে দরকার আছে কিনা তা সাধারণত দেখা হয় না। বাস্তবায়িত এলাকা ও জনচাহিদা-ভিত্তিক তথা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন কিনা তা চাহিদা যাচাই ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ করার উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া ফিজিবিলিটি তথা প্রকল্পের চাহিদা আছে কি-না প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব ('ইআইএ') ও সামাজিক প্রভাব যাচাই ('এসআইএ') না করার অভিযোগ দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদনের পর তাড়াহুরো করে ও নিয়ম-রক্ষার্থে ইআইএ সম্পন্নকরণের উদাহরণ রয়েছে।

৪.৬.২ ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদন

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা একনেকে বৈঠকে অনুমোদনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপনের আগে আইএমইডি[২৭৩]তে কমপক্ষে সাতদিন পূর্বে জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে বন অধিদপ্তর এসব সভার ঠিক পূর্বমুহূর্তে আইএমইডি'র মতামত না নিয়ে আইএমইডি'র প্রতিনিধির কাছে জমা দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এমতাবস্থায় আইএমইডি প্রকল্প প্রস্তাবনায় মতামত দেওয়ার সুযোগ পায় না। এতে প্রকল্পের বিভিন্ন আইটেমের প্রাক্কলনে তথ্যগত ভুল ও অসঙ্গতি থেকে যায়, যেমন- কী লাগবে বা লাগবে না তা ত্রুটিপূর্ণভাবে করা, প্রকল্পের কোনো কোনো আইটেমে অস্বাভাবিক মূল্য ধরা এবং লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সঠিকভাবে তৈরি না করা, ইত্যাদি। মূলত ইতোপূর্বেকার কোনো প্রকল্পের প্রাক্কলন কপি ও পেস্ট করে দেওয়ায় এ ধরনের ত্রুটি থেকে যায় বলে আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের একাংশের অভিমত। বিধিমোতাবেক আইএমডি'র মতামত নিয়ে তা করা হলে এসব সমস্যা এড়ানো যেতো বলে আইএমইডি'র কর্মীদের একাংশের অভিমত।

৪.৬.৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি

আইএমইডি'র সাইট ভিজিটের জবাব দেওয়ার জন্য এক মাস সময় দেওয়া হলেও ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে বন বিভাগ কোনো জবাব না দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অধিদপ্তরের একই কর্মকর্তা কর্তৃক একাধিক প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যা পরিকল্পনা কমিশনের বিধি-বহির্ভূত। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান না করা ও কোনো প্রকার কার্যকর জবাবদিহিতা ছাড়া প্রকল্পের মোটরযান পারিবারিক কাজে সার্বক্ষণিক ব্যবহার, এবং সরকারি বিধি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষে তিন মাসের মধ্যে সরকারি 'পরিবহন পুলে' প্রকল্পের মোটরযান জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকরা তা অনুসরণ করেন না দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

৪.৬.৪ সরকারি ক্রয় নীতিমালা লঙ্ঘন

সরকারি ক্রয় নীতিমালা মোতাবেক প্রকল্পের প্রস্তাবনায় উন্মুক্ত দরপত্র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করার বিধান থাকলেও উচিত হলেও বন অধিদপ্তরের প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে ক্রয় করা হবে প্রকল্প প্রস্তাবনায় তা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ করা হয় না। এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট ঠিকাদারের যোগ্যতা লক্ষ রেখে দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণ করা। এতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় মোতাবেক নির্দিষ্ট দরদাতা যোগ্যতাপূরণ সাপেক্ষে দরপত্রে অংশ গ্রহণ ও কার্য্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্মকর্তা ও ভেণ্ডরের মধ্যে আর্থিক ও সুযোগ-সুবিধা, যেমন- বিদেশ ভ্রমণ, বিধি-বহির্ভূতভাবে লেনদেন হয়।

৪.৬.৫ প্রকল্পের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানো

প্রকল্প থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় তা বাস্তবে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। সাধারণত বন প্রকল্পের এগজিট প্ল্যান না থাকা: প্রকল্প শেষে কী করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয় না। উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্প থেকে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এবং

[২৭২] তথ্যদাতা: সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন বিট কর্মকর্তার মত।

[২৭৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' বা আইএমইডি যা শুধু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ প্রকল্প এলাকা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ সরজমিনে পরিদর্শনের ও পরীবিক্ষণ করে কোনো বিচ্যুতি দেখলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট তার ব্যাখ্যা দাবি করে এখতিয়ার রয়েছে। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একাংশ।

একই সাথে প্রতীয় প্রতিবেদন বন অধিদপ্তরের কোনো কাজে লাগানোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করার উভিযোগ। প্রকল্প শেষে যে নথি ও প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় তা অনেক ক্ষেত্রে খুলে দেখা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৭৪]আইএমইডি বন অধিদপ্তরের প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্র দেখার সুযোগ পায় না, কারণ আইএমইডি'র কর্মীদেরও কাজের চাপ থাকায় তারা ক্ষেত্র বিশেষ বন অধিদপ্তর যেভাবে দেখাতে চায় সেভাবেই দেখতে হয়।

৪.৬.৬ অর্থ অপচয়

৪.৬.৬.১ অপ্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ: একটি প্রকল্পের আওতায় একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিকবার প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করে বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে যাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তারা অনেক ক্ষেত্রে যেতে পারে না। প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রকল্পের নাম নির্মল বায়ু হলেও বাস্তবে বায়ু নির্মল ও বিশুদ্ধ করার মতো কোনো উপাদান বা কম্পোনেন্ট রাখা হয় নি। এছাড়া এই প্রকল্পে বিদেশি পরামর্শক দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যা অত্যাবশ্যক ছিলো না।

৪.৬.৬.২ বাঘ শুমারি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ইউএসএআইডি থেকে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত শতাধিক কোটি টাকায় শিক্ষার্থীদের দিয়ে দায়সারাভাবে সুন্দরবনে বাঘ শুমারি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই প্রকল্প দ্বারা রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ের অভিযোগ রয়েছে।

৪.৬.৬.৩ জনবল সংকটের অযুহাত দিয়ে অনিয়ম ও সমস্যা এড়ানোর প্রচেষ্টা: প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নেতিবাচক পর্যবেক্ষণের জবাবে বন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সাধারণত জনবল ও লজিস্টিকস ঘাটতিকে দায়ী করার মধ্য দিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অনিয়ত ধামাপাচা দেওয়ার চেষ্টা করার উদাহরণ রয়েছে।

৪.৭ নিরীক্ষা আপত্তির ধরন (২০১৮ - ২০১৯)[২৭৫]

বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে সিএজি'র নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও আপত্তির মধ্যে সরকারি অর্থ অপচয়, সরকারের আর্থিক ক্ষতি, রাজস্ব ক্ষতি বা রাজস্ব হতে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করা, কাল্পনিক ব্যয় প্রদর্শন, বিধিমোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করা, ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য। ২০২৮ থেকে ২০১৯ অর্থবর্ষে বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সিএজি'র আপত্তির কিছু তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৯: সিএজি'র অডিট আপত্তির ধরন (২০১৮ - ২০১৯ অর্থবছর)	
▪ পুরাতন সেগুন গাছের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপন না করা (৫৩ কোটি আশি লক্ষ টাকা) ▪ জব্দ বনজ দ্রব্য টেণ্ডারে বিক্রয়ের বকেয়া মূল্য (২ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাজার ৪৩৪ টাকা) ▪ আর্থিক ক্ষমতার বা প্রাধিকার অতিরিক্ত টাকা ব্যয়ে যানবাহন মেরামত (৮৬ হাজার ১১৩ টাকা) ▪ অকেজো মোটরযান বিক্রী না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি (২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা) ▪ আউটসোর্স পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগের দরপত্র বাতিল না করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি (১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৯ টাকা) ▪ সৃজিত বাগানের ২০% হারে কাল্পনিক শূন্যস্থান পূরণ (১৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৫০ টাকা) ▪ অ্যাপ্যায়ন বিলের ভাউচার না পাওয়া (৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৪৫ টাকা) ▪ ভ্যাটের টাকা না পাওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি (১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৭৫ টাকা) ▪ গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে অফিস সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও মোটরযান ক্রয় (৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা)	▪ ফরেস্ট রেস্ট হাউজের নির্ধারিত ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি (৪৮ হাজার টাকা) ▪ নিলামে বিক্রীত লটের টাকার ওপর আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি (৫৫ হাজার ৬৯০ টাকা) ▪ ব্যাংকে জমাকৃত টাকার সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া (১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৫ টাকা) ▪ অনাদায়ী ভ্যাট ও তা কর্তন না করা ▪ বিলের ভাউচার না পাওয়া ▪ সরঞ্জাম মেরামতের ভাউচার সংযুক্ত না করা ▪ কাল্পনিক ব্যয় দেখানো ▪ উডলট বিক্রির অনাদায়ী টাকা ▪ ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ▪ আউটসোর্সের ওপর ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তন ▪ বিধি না মেনে অতিরিক্ত ব্যয়

[২৭৪] তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তর ও আইএমইডি'র কর্মীদের একাংশ।

[২৭৫] তথ্যসূত্র: প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর। তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ১৯ নভেম্বর ২০১৯।

পঞ্চম অধ্যায়:
সুপারিশমালা

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি বনভূমির সুরক্ষা ও বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রদত্ত ক্ষমতা ও সক্ষমতার কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগে বন অধিদপ্তর ব্যর্থ। বন আইনের (১৯২৭) কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ৯৩ বছরের পুরোনো বন আইনটি আমূল সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযুগী করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। সনাতন পদ্ধতি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা বনকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সুযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- রিমোট সেনসিং) সম্প্রসারণসহ এর সর্বোচ্চ ও কার্যকর ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে বন অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি পুনর্বিন্যাস বা ঢেলে সাজানো উদ্যোগ অনুপস্থিত। বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা চালু না হওয়ার পেছনে অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের মধ্যে চাকরি হারানোর ভীতি, প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তাতে বাধা সৃষ্টির মতো ঘটনা অনেকাংশে দায়ী। গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কার প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত কোনো পরিবর্তন আসবে না বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। এতে বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও বাড়তি জনবল বাবদ রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকার রক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারহরণ, বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ঘোষণাসহ জবরদখল উচ্ছেদের নামে অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা চর্চার সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়েছে।

সংরক্ষিত বন ও এর আশেপাশে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশ সমীক্ষা সম্পাদন এবং এসবের উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুমোদনের ঘটনায় সার্বিকভাবে অধিদপ্তরের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতাও প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া বনের জমি অবৈধভাবে দখল, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ এবং প্রাকৃতিক বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

বন অধিদপ্তরের সকল স্তরে বনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের কার্যকর তদারকি, পরিবীক্ষণ ও 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতির একটা বড় ক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন দুর্নীতির ও অনিয়মের সুবিধাভোগী। বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক যোগসাজশপূর্ণ দুর্নীতির বিচারহীনতা কার্যত বন ও জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস উদ্বেগজনকভাবে অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং দেশের প্রাকৃতিক বন ও বাস্তুতন্ত্র ক্রমাগত উজাড় ও বনের জমি উদ্বেগজনকভাবে জবরদখল সংক্রান্ত ঘটনার দায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বন অধিদপ্তর তার দায়ভার এড়াতে পারে না, এমতাবস্থায় প্রতিবেশি দেশসহ উন্নত দেশসমূহের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বস্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা গেলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাসসহ বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সুযোগ ও ঝুঁকি কমবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও সুশাসিত বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বন ও বন্যপ্রাণীর বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কার্যকর বাস্তবায়ন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপূরণে বন অধিদপ্তর আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫.২ সুপারিশ

গবেষণার আলোকে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বন অধিদপ্তরকে একটি সক্ষম ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে-

ক. নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যা করণীয়

১. রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে।

২. বন-নির্ভর মানুষের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

৩. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে পরিবেশবান্ধব বনসৃজন করতে হবে। সংরক্ষিত বনের জমিতে সকল প্রকার সামাজিক বনায়ন কিংবা সহবন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বৃক্ষশূন্য প্রাকৃতিক বন পূর্বের অবস্থায় তথা প্রাকৃতিক বনে রূপদানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. একনেকের বৈঠকে বনভূমি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা পেশ ও তা অনুমোদনের পূর্বে বন অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করাসহ সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে উপকারভোগীদের প্রাপ্ত মুনাফা প্রদান ও উক্ত বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. বন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সংশোধন, প্রণয়ন ও প্রতিপালন

৬. বন আইনের আমূল সংস্কার করে যুগোপযুগী ও ক্ষমতায়িত করতে হবে। বন-নির্ভর মানুষের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষাসহ বন আইনের সংস্কার ও বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৭. 'বন আইন ১৯২৭' এর কিছু সাপ্লিমেন্টারি আইন, যেমন- প্রতিবেশি দেশ ভারতের 'ট্রি কনজারভেশন আইন', 'কমন প্রোপার্টি আইন', ইত্যাদির ন্যায় বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৮. শালবন রক্ষার লক্ষ্যে 'আটিয়া অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২' এর আদলে একটি বিধি প্রণয়ন করতে হবে। উল্লেখ্য, এই আইনটি সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর ওপর রায়ের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে।

৯. বন অধিদপ্তরের নিকট হতে লিখিত আদেশ বা নির্দেশনা প্রাপ্তি-উত্তর বিদ্যুৎ বিভাগ স্থানীয় কোনো করাত-কলে অথবা সরকারি ঘোষিত সংরক্ষিত বনের ভেতরের যেকোনো স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রেও বন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি গ্রহণের বিধান করতে হবে।

১০. বন মামলা একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে পৃথক ও স্বতন্ত্র আদালত গঠন করা যেতে পারে।

১১. বন আইন ও বিধিমালাসমূহের কার্যকর প্রতিপালন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। 'বন আইন ১৯২৭' ও 'বন্যপ্রাণী আইন ২০১২' দায়েরকৃত মামলার অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা অধিদপ্তরকে দিতে হবে।

১২. নিম্ন ও উচ্চ আদালতে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা, যেমন- মামলার নথিপত্র তৈরি ও সংগ্রহ, শুনানিতে উপস্থিতি, রিটেইনার ফি, ইত্যাদির জন্য পৃথক আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। রিটেইনারদের (বন মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী) ফি যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

গ. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১৩. বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে বন অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো পর্যালোচনা-পূর্বক জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।

১৪. বনকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তন ও এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. বন অধিদপ্তর যেহেতু একটি ভূমি কেন্দ্রিক সরকারি প্রতিষ্ঠান, এখানে নিজস্ব ও স্থায়ী ভূমি কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে, যিনি ভূমির জটিলতা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বন বিভাগকে সহায়তা করতে পারবে। লিগ্যাল ইউনিটে ওয়াইল্ডলাইফসহ বন আইন ও বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে এমন আইনজীবী ও বনকর্মী নিয়োগ দিতে হবে করতে হবে।

১৬. ফরেস্ট ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী বনকর্মীদের সমমর্যাদা সম্পন্ন সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কর্মীদের সাথে সমতা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৭. বন অধিদপ্তরকে একটি ইউনিফরমধারী বিভাগে রূপান্তর করা যেতে পারে।

১৮. কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মীর প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বন মামলা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্তদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. দুর্গম এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বনকর্মীদের জন্য বিশেষ করে বন প্রহরী, বোটম্যান ইত্যাদির জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাহাড় ও চড়াঞ্চলে কর্মরত বনকর্মীদের জন্য সর্বশেষ মূল বেতনের ওপর ঝুঁকিভাতা প্রবর্তন করতে হবে।

২০. কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার পাশাপাশি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে।

ঘ. অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

২১. মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো (দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য কক্ষ, বসার জায়গা, জব্দ ও উদ্ধারকৃত বনজসম্পদ সংরক্ষণের সুবিধাসহ ইত্যাদি) ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং এসবের নিয়মিত সংস্কারের জন্য থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২২. সকল স্তরের কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা, যেমন- কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা ও এসবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. ডিজিটাইজেশন

২৩. বন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কার্যালয়ের দাপ্তরিক কাজসহ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে। এর অংশ হিসেবে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম-ভিত্তিক প্রযুক্তির (জিআইএস) সম্প্রসারণ করতে হবে। বন ব্যবস্থাপনায় সার্ভেলেন্স ড্রোন, ট্রাকিং ডিভাইস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), স্যাটেলাইট ইমেজ, ইত্যাদির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২৪. বনভূমির জমির সকল দলিল, রেকর্ডপত্র ও মানচিত্র, মামলার আলামত, ইত্যাদি এখনও আধুনিক পদ্ধতিতে (ডিজিটাল ও অনলাইনসহ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে করতে হবে। এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরিসহ উক্ত ভূমি উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা

২৬. ডিএফওদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ও ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সকল প্রকার অর্থ বরাদ্দ (অফিস পরিচালন ব্যয় ও বন প্রকল্পের অর্থসহ), বনকর্মীদের বেতন-ভাতা ও লেনদেন অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক করতে হবে।

ছ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

২৭. সকল পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সকল কর্মকাণ্ড কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। সংশ্লিষ্ট ডিএফও ও বন সংরক্ষককে সকল কার্যালয় হতে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮. বন অধিদপ্তরের বনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের নিয়মিত 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' এর ব্যবস্থা প্রবর্তন/চালু করতে হবে। সিএজি'র নিরীক্ষা দলে বনখাত সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২৯. সকল সংরক্ষিত, রক্ষিত বন ও বন বিভাগের মালিকানাধীন জমির সীমানা চিহ্নিত করে তা জনসমক্ষে দৃশ্যমান ও অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩০. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল (যেমন- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দকৃত ও জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

জ. দুর্নীতিপ্রতিরোধে পদক্ষেপ

৩১. মাঠ পর্যায়ের সকল বন কার্যালয়ের পরিচালন ব্যয়সহ সকল প্রকার বরাদ্দকৃত অর্থ, বাজেট, বেতন-ভাতা, ইত্যাদি বিভাগীয় বন কার্যালয়ের স্থলে সরাসরি স্থানীয় ও সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩২. বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের গুণাবলি, সততা ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির/ইমেজ/অতীত রেকর্ড ভাল আছে এমন কর্মীদের বন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে, যেমন- প্রধান বন সংরক্ষক, ডিএফও, প্রকল্প পরিচালক, ইত্যাদি পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩৩. ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত, যেমন- বেতন বৃদ্ধি, নগদ অর্থ পুরস্কার, পদোন্নতি, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। খারাপ কাজের ক্ষেত্রে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা, গুরুতর অপরাধের অভিযোগ পাওয়া গেলে অন্যত্র বদলি না করে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি, অভিযোগ প্রমাণ হলে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে।

৩৫. সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩৬. অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরকরণে বনকর্মী ও অন্যান্য অংশীজন-বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্ত অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরসন বাধ্যতামূলক ও সংশ্লিষ্টদের কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৭. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুততার সাথে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

ক. নীতি ও আইন

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২. *৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৫/১৬-২০১৯/২০*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৭, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/35rsgkI, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ নভেম্বর ২০১৯।

৩. *বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৭-২০৩৬ (চূড়ান্ত খসড়া)*, বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সিআরপিএআরপি (ডিসেম্বর ২০১৬)।

৪. *জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া)*, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমান নাম 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়'), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৫. *বাংলাদেশ ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি* (২০১৬-২০৩১), বন অধিদপ্তর (সেপ্টেম্বর ২০১৬), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা-৩০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2tg1z5d, সর্বশেষ ভিজিট: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

৬. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১৩ নভেম্বর ২০১৯।

৭. *বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (জুলাই ১০, ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1102.html?lang=bn, সর্বশেষ ভিজিট: ১ ডিসেম্বর ২০১৯।

৮. দ্যা ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯২৭, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-144.html, সর্বশেষ ভিজিট: ২৮ নভেম্বর ২০।

৯. বাংলাদেশ ওয়াল্ডলাইফ (প্রিজারভেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৭৪।

১০. 'দ্যা প্রাইভেট ফরেস্টস অর্ডিনেন্স ১৯৫৯', ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিনেন্স নম্বর ৩৪ (মে ১১, ১৯৫৯), বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2QMvQkf, সর্বশেষ ভিজিট: ২২ নভেম্বর ২০১৯।

১১. Public Procurement Act 2006 এবং Public Pocurement Rules 2008, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.rhd.gov.bd/Documents/PPR/07%20-%20ThePublicProcurementAct2006(041207)45.pdf এবং http://www.btcl.com.bd/files/img/act/PPR_Public-Procurement-Rules-2008-English.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২ জানুয়ারি ২০২০।

১২. *দি বেঙ্গল রাইনোসিরাস প্রিভেনশন অ্যাক্ট* ১৯৩২

১৩. *দি প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট* ১৯৬৪।

খ. বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন

১৪. বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৯; এস.আর.ও নম্বর ৩০৮-আইন/২০১৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৫. *রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০১৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (১২ নভেম্বর ২০১৭), বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

১৬. *করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা*, ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (মে ২৭, ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/7a968b69-7b0f-4c58-8530-970040ac659a/Saw-mill-(Licence)-Rule-2012, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

১৭. Bangladesh Biosafety Rules 2012, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Gazette, Additional Copy (২ সেপ্টেম্বর ২০১২), বিস্তারিত দেখুন: http://bangladeshbiosafety.org/wp-content/uploads/2017/04/Bangladesh_Biosafety_Rules_2012.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

১৮. *সামাজিক বনায়ন বিধিমালা*, ২০০৪ (মে ২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত), বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/0c05d1d9_54b2_4b0c_91d3_b1008b50c591/Social%20Forestry%20Rules%202004.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

১৯. *বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (৭ মে ২০১১), বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/5b0d6820-0888-489c-b762-f8772bc5900f/Forest-produce-transit-(control)-rules-2011, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

২০. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১, সংস্থাপন বিভাগ, মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি ০১, ১৯৮১।

২১. দ্যা বিসিএস (একজামিনেশন ফর প্রোমোশন রুলস, ১৯৮৬; এস.আর.ও. নম্বর ৬৪-ল/৯৮, এমই রেজি. ৫,- ৬১/৯৮-৫৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নোটিফিকেশন (২৭ এপ্রিল ১৯৯৮), বাংলাদেশ গেজেট (২৪ ডিসেম্বর ২০১৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি: বন) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯, ১৯৮৭), এস.আর.ও. ২৯২-এল/ ৮০/ইডি/আইসি/এস ২-৪/ ৮০-১০৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৩. *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা (ডিসেম্বর ২৪, ২০১৮); এস.আর.ও. নম্বর ৩৭৮-আইন/২০১৮, *জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিধি-৫ শাখা*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮।

২৪. প্রজ্ঞাপন নম্বর সম-/জেএ-৪/৩৬/৯৩-২২৫, তারিখ: ১৭/০৪/১৯৯৪, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৫. স্মারক নম্বর ১৭৯০/সলিসিটর/২০০২, তারিখ: ১৫.০৩.২০০৩ ও স্মারক নম্বর ১০০১/সলিসিটর/৯২-২০৫১, তারিখ: ৩০-০৬-১৯৯৩, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৬. ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯।

গ. কনভেনশন

২৭. *প্যারিস এগ্রিমেন্ট*, ইউনাইটেড নেশন্স ২০১৫, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/37lR3bn

২৮. *কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস অব ইন্টারন্যাশনাল ইমপোরটেন্স স্পেশালি এট ওয়াটারফউল হেবিটেট*, রামসার, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, প্রত্যয়িত অনুলিপি, ইউনেস্কো, প্যারিস (জুলাই ১৯৯৪), বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2F6ikm5.

২৯. *দি প্রোটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৫০।*

৩০. *এলিফ্যান্ট প্রিজারভেশন এ্যাক্ট ১৮৭৯; দ্যা ওয়াইল্ড বার্ড অ্যান্ড এ্যানিমেলস প্রটেকশন অ্যাক্ট ১৯১২।*

৩১. Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance specially as waterfowl Habitat)

ঘ. গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনা

৩২. গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (জিএফডব্লিউ), *কান্ট্রি ফরেস্ট ডাটা*, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/358Xr4i, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০।

৩৩. চৌধুরী, মোহাম্মদ সফিউল আলম,২০১৮, 'সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই; নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই, স্মরনিকা: জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮,' বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৩৪. চৌধুরী, মোহাম্মদ সহিদ হোসেন, নাহিদ নাজিয়া, শিজেইউকি ইজুমহয়ামা, নূর মোহাম্মদ এবং মাসো কেয়কি, ২০১৪, 'পেটারনস এন্ড এক্সটেন্ট অব থ্রেটস টু দ্যা প্রোজেক্টেড এরিয়াজ অব বাংলাদেশ: দি নিড ফর এ রিলক এট কনজারভেশন স্ট্রেটিজিজ,' *পার্কস, ভল্যুউম ২০.১*, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/fiFGS, সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ জানুয়ারি ২০২০।

৩৫. ডেভিড একস্টেইন, ম্যারি-লিনা হাটফিল্স এবং মায়েক উইংস, ২০১৯, 'দি গ্লোবল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ফর ২০১৭,' *জার্মান ওয়াচ*, জার্মানি. বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/acoqY, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ মে ২০২০।

৩৬. ইউএন-রেড, বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি, বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bforest.gov.bd/site/page/8b1f3a13-72b4-4639-b43e-bbd59a2bc2e0/-, সর্বশেষ ভিজিট-২৫ ডিসেম্বর ২০১৯।

৩৭. *প্রথম আলো*, ২২ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/bkABN, ভিজিট করা হয়েছে: ২৭ জানুয়ারি ২০২০।

৩৮. *হাউজহোল্ড বেইজড ফরেস্ট্রি সার্ভে ২০১১-১২*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃষ্ঠা ১২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2SDLJMj, সর্বশেষ ভিজিট: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯।

৩৯. *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল - জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা*, ইউএসএআইডি - উইন্ডরক ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৩।

৪০. ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দি ইউনাইটেড নেশন্স (এফএও), ২০১৫, গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫, ডেস্ক রেফারেন্স, রোম, বিস্তারিত দেখুন- http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf , সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ অক্টোবর ২০১৯।

৪১. *বাংলাপিডিয়া*- বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2SRS1Is, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ অক্টোবর ২০১৯)।

৪২. Islam, Kazi Kamrul and N Sato, ২৫ জুন ২০১২, `Deforestation, land conversion and illegal logging in Bangladesh: the case of the Sal (*Shorea robusta*) forests," *iForest - Biogeosciences and Forestry*,' ভল্যুম ৫, ইস্যু সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭৮, বিস্তারিত দেখুন: https://doi.org/10.3832/ifor0578-005, সর্বশেষ ভিজিট: ২৩ নভেম্বর ২০২০.

৪৩. Kamaluddin, Kamal, A., M., and M. Ullah, 1999, Land Policies, Land Management and Land Degradation in the HKH Region: Bangladesh Study Report. ICIMOD, Kathmandu, Nepal, In: A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends, edited by M. Millat-e-Mustafa, 2002), বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf.

৪৪. Khan, N.A., 2001, RETA 5900, Bangladesh Country Case Study (Final Report). AWFN, ADB, Manila, Philippines, In: A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends, edited by M. Millat-e-Mustafa, 2002), বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf.

৪৫. খুদা, মনজুর-ই, ১৪ আগস্ট ২০০৮, *ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকউন্টেবিলিটি ইন ফরেস্ট কনজারভেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট: প্রবলেমস এন্ড ওয়ে আউট*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/rp_Study_on_Forest.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ নভেম্বর ২০২০।

৪৬. Millat-e-Mustafa, M., 2002, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends, Institute for Global Environmental Strategies, পৃষ্ঠা ১১৬, বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯.

৪৭. Muhammed, N., Koike, M., Haque, F. and M.D. Miah, 2008, `Quantitative assessment of people-oriented forestry in Bangladesh: A case study in the Tangail Forest Division,' *Journal of Environmental Management*, ভল্যুম ৮৮, পৃষ্ঠা ৮৩-৯২.

৪৮. সামছ উদ্দিন, মো. ২০১৮, 'রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বর্তমান ও ভবিষ্যত: একটি পর্যালোচনা, স্মরনিকা ২০১৮, বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪৯. 'জেলা ভিত্তিক গেজেটভূক্ত বনভূমির হাল নাগাদ তথ্যাদি (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)', বন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট হতে ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/hxCL9, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ নভেম্বর ২০২০।

৫০. Rahman, Laskar Muqsudur, 1993, History of Forest Conservation in Indo-Bangladesh. Aranaya 2(2) (1993), পৃষ্ঠা ১৫ ২১-২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.researchgate.net/publication/316854482_History_of_Forest_Conservation_in_Indo-Bangladesh, সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

৫১. Rahman, Md. Habibur, Md. Abu Sayed Arfin Khan, Bishwajit Roy, Most. Jannatul Fardusi, 2011, `Assessment of Natural Regeneration Status and Diversity of Tree Species in the Biodiversity Conservation Areas of Northeastern Bangladesh,', *Journal of Forestry Research*, 22(4), পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৫৯, বিস্তারিত দেখুন: shorturl.at/rzEY8, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০.

৫২. Rashid, A. Z. M. Manzoor, Donna Craig, Sharif Ahmed Mukul and Niaz Ahmed Khan, July 2013, A journey towards shared governance: status and prospects for col-laborative management in the protected areas of Bangladesh, বিস্তারিত দেখুন: https://rb.gy/wjynx4, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪ নভেম্বর ২০২০.

৫৩. *The Journal of Forestry*, Volume 21, The Pakistan Forest Insytitute (1971), University of Minnesota, USA, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/39Cbp1X, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯.

৫৪. ডয়েচে ভেলে- https://bit.ly/2TeOBjf, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯; বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2Nngfqx, সর্বশেষ ভিজিট: ২ ডিসেম্বর ২০১৯।

৫৫. Wadud, A.N.M.A., 1989, 'Need for change in Forest Act 1927,' *Review Paper* No. 111, Institute of Forestry, University of Chittagong, Bangladesh, In: A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends, edited by M. Millat-e-Mustafa, 2002), পৃষ্ঠা ১১৭, বিস্তারিত দেখুন: https://iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/en/180/08_Bangladesh.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

৫৬. ফিলিপ গাইন, ২০০২, দ্যা লাস্ট ফরেস্টস অব বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর এনভারনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৫৭. মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ, তেত্রিশম সংস্করণ, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত চাকরির বিধানাবলী (বর্ধিত ও সংশোধিত), রোদ্দুর প্রকাশনী, ঢাকা।

৫৮. কিবরিয়া, এন জি, এস এ রহমান, এ ইমতিয়াজ এবং টি সুন্দরল্যাণ্ড, ২০১১, 'এক্সটেন্ট এন্ড কনসিকিয়েন্সেস অব ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন: সাকসেসিভ পলিসি অপশন্স ফর বাংলাদেশ,' *জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি*, বি১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/2sL49jJ, সর্বশেষ ভিজিট: ২২ জানুয়ারি ২০২০।

ঙ. প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু ওয়েবসাইট ও লিংক

৫৯. বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট: http://www.bforest.gov.bd/site/page/b24cdba5-14e0-4fde-8114-b7a557038915/-।

৬০. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-41501.html, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

৬১. http://www.bforest.gov.bd/

৬২. http://www.bforest.gov.bd/site/page/5b0d6820-0888-489c-b762-f8772bc5900f/Forest-produce-transit-(control)-rules-2011, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

৬৩. http://www.bforest.gov.bd/site/page/665d37e7-ce3a-4117-af13-f8147d448e98/-, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯)।

৬৪. https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/a2f633e5_8b6c_4213_b78c_ec966bd2a942/PA%20Rule%202017.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

৬৫. https://bforest.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bforest.portal.gov.bd/page/0c05d1d9_54b2_4b0c_91d3_b1008b50c591/Social%20Forestry%20Rules%202004.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ৬ জানুয়ারি ২০১৯)।

৬৬. https://bit.ly/2Fq5pLM, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

৬৭. https://plandiv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/9d9106e2_828d_4e33_819f_84ec5357ef4f/7th%20Five%20Year%20Plan%20Bangla%20Book.pdf

৬৮. https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

৬৯. https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

৭০. https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.

৭১. https://whc.unesco.org/en/list/?&type=natural.

৭২. https://whc.unesco.org/en/list/798, সর্বশেষ ভিজিট: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯.

৭৩. https://www.bbc.com/bengali/news-50367744, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯; প্রথম আলো- https://bit.ly/30hEN9m, সর্বশেষ ভিজিট: ০২ ডিসেম্বর ২০১৯।

৭৪. https://www.cites.org/eng/disc/what.php, সর্বশেষ ভিজিট: ২ ডিসেম্বর ২০১৯।

৭৫. Indian Forest Service (History), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. http://ifs.nic.in//content/Index/?qlid=2009&Ls_is=4093&lngid=1, সর্বশেষ ভিজিট: ৫ নভেম্বর ২০১৯।

৭৬. 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেইজ লিস্ট', ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার, https://whc.unesco.org/en/list/?&type=natural. সর্বশেষ ভিজিট: ২ জানুয়ারি ২০২০).

৭৭. shorturl.at/TUY05.

প্রতিবেদনে ব্যবহার করা কিছু কার্যকরি সংজ্ঞা

সংরক্ষিত (রিজার্ভ) বন: সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন এই বনে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারসহ যেকোনো কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ। বন ও সকল প্রকার সম্পদের ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষিত।

রক্ষিত বন:"রক্ষিত এলাকা" অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ধারা ১৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ও পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা ২২ অনুসারে গঠিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ধারা ২৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন।[২৭৬] রক্ষিত এলাকাগুলোতে স্বীকৃত প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত মূল্য সংরক্ষণ করা হয়। সরকারি মালিকানাধীন রক্ষিত বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ব্যতিত সকল ধরণের কার্যক্রম সম্ভব। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এই বন হতে শুধু ফলমুল, লতাপাতা, রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ, ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়। তবে গাছ কাঠতে হলে বন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

নিরবিচ্ছিন্ন বন: এ ধরণের বনের মধ্যে ব্যক্তিগত কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের জমি, বনের উপস্থিতি নেই। পার্বত্য এলাকা ও সুন্দরবনে নিরবিচ্ছিন্ন বন দেখা যায়।

জোত: প্রাকৃতিকভাবে বা সরকারি খাস জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা বনভূমিকে জোত বলা হয়।

'জোত পারমিট': সাধারণত ফার্নিচার তৈরি ও বিক্রির উদ্দেশ্যে জোতের গাছ কাটার জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান হলো 'জোত পারমিট'। এই প্রক্রিয়ায় যা থাকে: কী ধরনের গাছ (গাছের নাম, আকার)? গাছের সংখ্যা? কাটা গাছ ও কাঠ কোন পথে ও কী মাধ্যমে তা পরিবহন করা হবে? বনকর্মীদের দ্বারা গাছ কাটার পূর্বে গাছের ওপর নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা ও কাটার পর সিল দেওয়া (প্রতিটি গাছের টুকরোতে সিল থাকা বাধ্যতামূলক)। জোত প্রক্রিয়া শুরু হয় পাহাড়ের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে। ধাপ-১: ডিসি জমি এলোকেট করেন ও চৌহদ্দি তৈরি করেন। চৌহদ্দিভুক্ত গাছ মার্কিং ও তালিকা তৈরি করেন সংশ্লিষ্ট ডিএফও। এরপর চৌহদ্দিভুক্ত গাছে তালিকা ডিসিদের কাছে লিস্ট পাঠানো হয়। ডিএফওরা এটা চেক করবে, কিন্তু যে লিস্ট দিয়েছে সেটা অনুযায়ী গাছ নেই। তারা অতিরিক্ত গাছ দেখায় জোতে। দেখা যায় জোতে গাছ আছে ১০০০ টি, তারা দেখায় ২ বা ৩ হাজার। কিন্তু নিয়ম হলো যে জোতে যতো গাছ থাকবে সেই লিস্ট অনুযায়ী সেই জোত থেকেই গাছ কাটতে হবে। জোতের প্রত্যেকটা গাছে নম্বর দেয়া থাকে। যে যে নম্বর থাকবে গাছে, সেই একই নম্বরের হতে হবে। একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চিঁড়াই পারমিট না দেওয়া পর্যন্ত কোনো গাছ কাটতে পারবেনা। এসব কিছুই নোটবুকে বা লগবুকে লিখে রাখতে হবে। সবকিছুর তথ্য কম্পিউটারে থাকবে। যে যে জোতে গাছ কাটবে তার একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান থাকতে হবে। গাছ কাটার পর চেড়াইয়ের আগে অনুমতি/পারমিট নিতে হয়। গাছ কাটার পর গাছের গোড়া ও কাটা গাছে ডিএফও সিল দিতে হয়।

শুষ্ক মৌসুমে মূলত চকরিয়া, উখিয়াসহ পার্বত্য চট্ট্রগ্রামের নিকটবর্তী উপজেলাসমূহ থেকে ৫০-৬০ জন শ্রমিক নিয়ে সংশ্লিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ী তিন-চার তাবু খাটিয়ে অবস্থান করেন। গাছ কাটার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা পরিবহনকালে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর চেকপোস্টসহ বন অধিদপ্তরের চেকপোস্ট অতিক্রমকালে বিধিবহির্ভূত অর্থ বা প্রভাব খাটিয়ে পার করা হয়। কারবারি ও এলাকার মেম্বার হেডম্যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা- এসব ব্যক্তিকে ম্যানেজ করে ব্যবসায়ীরা জোত পারমিট আদায়/সংগ্রহ করেন।[২৭৭]

একজন আবেদন আবেদন করেন প্রথমে হেডম্যান বরাবর. হেডম্যান সেই কাগজ পাঠান সার্ভেয়র বরাবর, পর্যায়ক্রমে সার্ভেয়র কানোন গ্রুপকে, কানোন গ্রুপ এসি ল্যান্ডকে, এসি ল্যান্ড ইউএনও কে, ইউএনও ডিসি মহোদয়কে, ডিসি রেঞ্জ অফিসারকে তদন্ত কারার জন্য, রেঞ্জ অফিসার বিট অফিসারকে, এরপর সেই রিপোর্ট বিট অফিসার রেঞ্জ অফিসারকে এবং সর্বশেষ রেঞ্জ অফিসার ফাইনাল রিপোর্ট সাবমিট করেন ডিএফও সাহেবকে।[২৭৮]

বাফার এলাকা: প্রটেক্টেট এরিয়া রক্ষার জন্য ও মানুষের সুবিধার্তে বনের ভেতর বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া।

অংশগ্রহণমূলক বনায়ন: ২০০০ সালে সংশোধীত বন আইনে সামাজিক বনায়ন বিষয়টি সংযোজন করা হয়। পারটিসিপেটরি ফরেস্ট এর কার্যক্রম ৮০র দশকে শুরু হয়। প্রথমদিকে অনেকে ডিলেমার মধ্যে ছিলো। তারা ভাবতো যে সরকারি শেয়ার হয়তো পাবে না। পরে ১-২ টা সফলভাবে শেষ হওয়ার পর তারা যখন দেখলো যে এই ধরণের বনায়নে তাদের লাভ হয় তখন তারা ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলো। এই ধরণের বনায়ন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতেও করা যায়। ফলে অন্য জমি ওয়ালারাও আগ্রহী হলো।[২৭৯]

---

[২৭৬] *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল - জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা*, ইউএসএআইডি - উইন্ডরক ইন্টারন্যাশনাল, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৩।

[২৭৭] তথ্যদাতা: একজন গণমাধ্যম কর্মী।

[২৭৮] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্টার, কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

[২৭৯] তথ্যদাতা: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক।

ফরেস্ট রেঞ্জারের কার্যাবলী: বিট অফিস এবং রেঞ্জ অফিসের সকল জনবলের কাজ বিতরণ, তদারকি ও মূল্যায়ন; ঢাকা বন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বন নতুন বন সৃজন, পূন: বনায়ন, বন ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা; সামাজিক বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগনকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রকল্প নির্ধারণ, উপকারভোগী নির্ধারণ এবং সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।[২৮০]

বিট অফিসের প্রধান প্রধান কাজ: বিট অফিসগুলোর অন্যতম কাজ হলো সংশ্লিষ্ট বন ও সীমানায় টহল দেওয়া। এজন্য বিট অফিসগুলোর সাথে ফরেস্ট গার্ড আছে-যাদের কাজ হলো কাঠ চুরি এবং অন্যান্য বনজসম্পদ রক্ষার জন্য টহল দেওয়া। ফরেস্ট গার্ড বিভিন্ন উপায়ে টহল দেয়। কখনো পায়ে হেটে, কখনো মোটরসাইকেলে আবার কখনো এ্যাম্বুশ করে টহল কার্যক্রম চালায়।[২৮১]

ফরেস্ট স্টেশন: স্টেশনগুলো জেলেদের মাছ ধরার অনুমতি দেয়। তবে তারা মাছ ধরে কিনা তা আমাদের টহল দল দেখে থাকে। স্টেশনগুলো রেভেনিউ সংগ্রহ করে রেঞ্জ অফিসে জমা দেয়। এরপর রেঞ্জ অফিস তা ব্যাংকে জমা দেয়।

সহ-ব্যবস্থাপনা: বনাঞ্চলের রক্ষিত এলাকা সমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ১৭৭,৫৪৭টি সংরক্ষিত এলাকা আছে যা মোট ভূমির প্রায় ১২.৭ শতাংশ, বাংলাদেশে এ হার প্রায় ১০ শতাংশ।[২৮২] সহ-ব্যবস্থাপনা বা যৌত ব্যবস্থাপনা বা শেয়ার গভর্নেন্স এসকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার বিশ্বব্যাপী প্রচলিত একটি পদ্ধতি। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সরকার এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করে। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ন্যায় বিচার ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রচলন হয়। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনেগোষ্ঠী, বনজসম্পদ ব্যবহারারী ও অন্যান্য অংশীজন সরকারের পাশাপাশি বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সুষ্ঠ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউএসএআইডি'র সহায়তায় নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) এর মাধ্যমে পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় পরিক্ষামূলকভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ২২টি রক্ষিত বনে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।[২৮৩]এসকল রক্ষিত এলাকায় ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহায়তা বাস্তবায়ন হচ্ছে। বন আইন ১৯২৭ এ বনের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বন অধিদপ্তর ২০০৬ সালে প্রকাশিত (সংশোধিত ২০০৯) সহ-ব্যবস্থাপনা গেজেটের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে। রক্ষিত এলাকা বিধিমালা ২০১৭ এ সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আইনী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিক বনায়ন: স্থানীয় দরিদ্র নারীসহ সাধারণ জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে অবক্ষয়িত বনভূমি ও প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। জীবিকার জন্য গাছ রোপন ও পরিচর্যাসহ বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বনজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, লভ্যাংশ বন্টন ও পূনঃবনায়ন ইত্যাদি কাজে স্থানীয় দরিদ্র ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে স্থানীয় জনগণের যেমন জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলে পুণরায় বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় আনা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগণ এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক, বাস্তুসংস্থানিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন। সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য কেবল 'গাছ নয়, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীও'।[২৮৪] এ ধরনের সহায়তার লক্ষ্য শুধু গাছ লাগানো ও সেসব গাছের যত্ন নেওয়ার জন্য নয়, বরং গাছ রোপণকারীরা যাতে লাগানো গাছের সুফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তারও নিশ্চয়তা বিধান। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রদত্ত সামাজিক বনায়নের সংজ্ঞা হচ্ছে 'বনায়ন কার্যক্রমে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্তকরণের যেকোন পরিস্থিতি'।[২৮৫] শিল্পভিত্তিক বৃহদায়তন বনায়ন এবং কেবল কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক উন্নয়ন সহায়ক অন্যান্য ধরনের বনায়ন সামাজিক বনায়ন নয়, বরং গোষ্ঠীভিত্তিক বনায়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানকল্পে বনশিল্প ও সরকারি প্রচেষ্টায় পরিচালিত কর্মকাণ্ড সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভুক্ত।[২৮৬]

---

[২৮০] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, ঢাকা বন বিভাগ।

[২৮১] তথ্যদাতা: একজন ফরেস্ট রেঞ্জার, ঢাকা বন বিভাগ।

[২৮২] মোঃ সামছ উদ্দিন, রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বর্তমান ও ভবিষ্যত: একটি পর্যালোচনা, স্মরনিকা ২০১৮, বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৮), পৃষ্টা-১৩২।

[২৮৩] সূত্র: বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://www.bforest.gov.bd/site/page/7860ce97-a221-401e-9ca7-6870649c937c/-(accessed no 21 October 22, 2019)

[২৮৪] সূত্র: সামাজিক বনায়ন, বাংলাপিডিয়া। বিস্তারিত: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Social_Forestry, accessed no 21 October 27, 2019.

[২৮৫] প্রাগুক্ত...

[২৮৬] প্রাগুক্ত...

দেশের সামাজিক 'বনায়ন বিধিমালা ২০০৪' কে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করে 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১০' প্রনয়ণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সরকারী বনভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ১৯৮১-৮২ সাল হতে এ যাবৎ মোট ৮৪ হাজার ৩৭৮ হেক্টর বিভিন্ন বাগান এবং ৬৮ হাজার ৮৩০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।[২৮৭] এসকল সৃজিত বাগানের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৫৫ জন, যার মধ্যে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫০৭ জন।[২৮৮] সামাজিক বনায়ন হতে অর্জিত লভ্যাংশের ২৮৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৬৮ টাকা উপকারভোগী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করা হয়। সামাজিক বনায়ন হতে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৩৩১ কোটি ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৫৬ টাকা।[২৮৯]

সারণি ১০: সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ বণ্টন[২৯০]

বনায়নের ধরণ	লভ্যাংশ বন্টনের হার
উডলট এবং এগ্রো-ফরেস্ট্রি	বন বিভাগ-৪৫%, উপকারভোগী-৪৫%, বৃক্ষরোপন তহবিল-১০%
শালকপিস বনায়ন রক্ষণাবেক্ষণ	বন বিভাগ-৬৫%, উপকারভোগী-২৫%, বৃক্ষরোপন তহবিল-১০%
স্ট্রিপ বনায়ন	বন বিভাগ ১০%, ভূমির মালিক/দখলী স্বত্বাধিকারী-২০%, উপকারভোগী-৫৫%, ইউনিয়ন পরিষদ-৫%, বৃক্ষরোপন তহবিল-১০%
চরাঞ্চল ও উপকূলীয় বনায়ন	বন বিভাগ-২৫%, উপকারভোগী-৪৫%, জমির মালিক/দখলদার-২০%, বৃক্ষরোপন তহবিল-১০%

দেশের মোট জ্বালানি ব্যয়ের ১৩ শতাংশ আসে কাঠ থেকে। গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহারের জন্য সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি হলো কাঠ। বাংলাদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় ৬৫ শতাংশ জ্বালানি কাঠ এবং বাকি ৩৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয় শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে।[২৯১]

[২৮৭] মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী, সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই; নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই, স্মরনিকা: জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পৃষ্টা-১৬।

[২৮৮] প্রাগুক্ত...

[২৮৯] প্রাগুক্ত...

[২৯০] খান, চৌধুরী, হুদা এবং মন্ডল ২০০৪; পৃষ্টা ১২৭-১২৮ এবং সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪।

[২৯১] https://plandiv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/9d9106e2_828d_4e33_819f_84ec5357ef4f/7th%20Five%20Year%20Plan%20Bangla%20Book.pdf

সংযুক্তি ১: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন/বনাঞ্চল

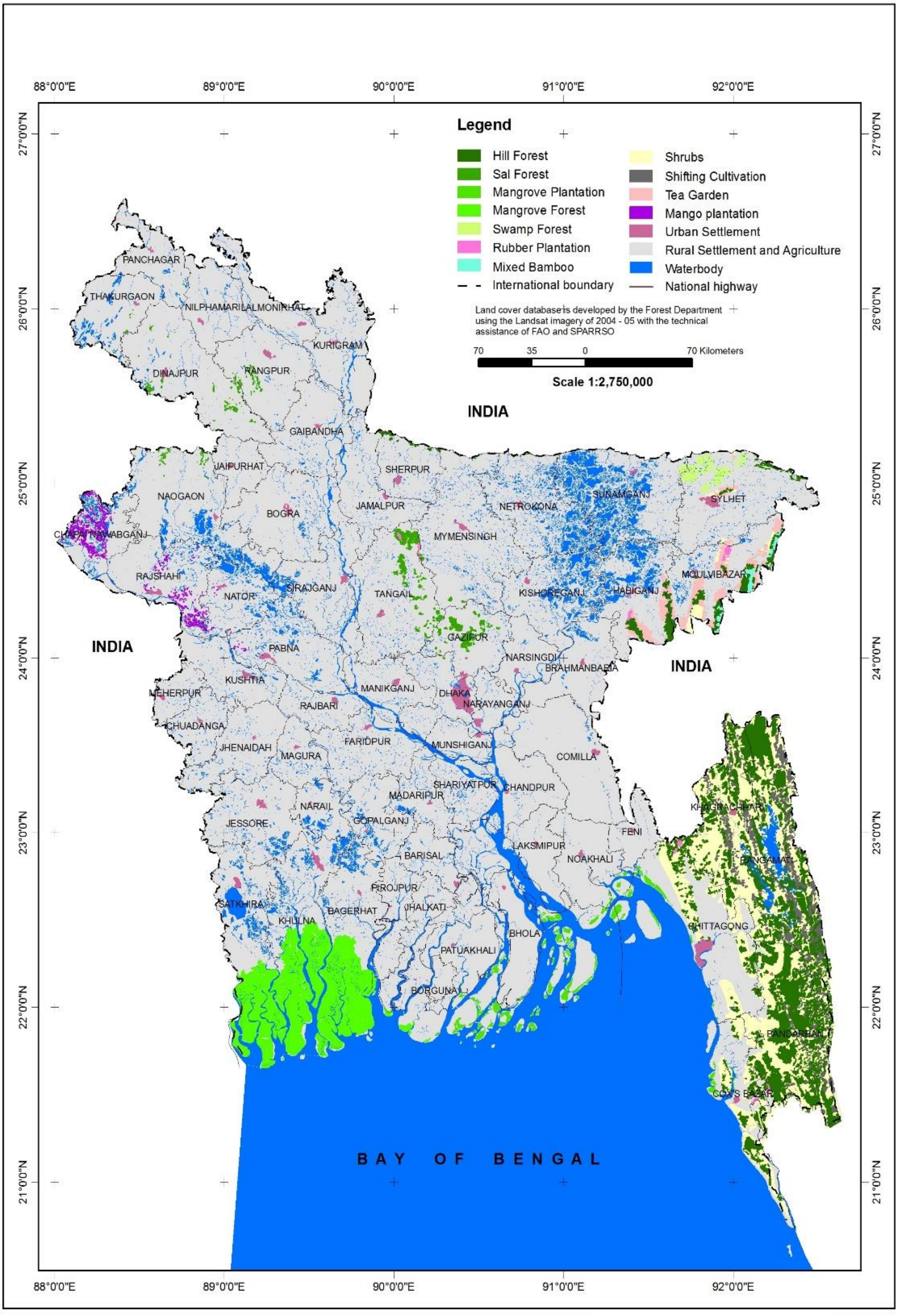

সূত্র: ওয়েবসাইট

সংযুক্তি ২

সারণি ১১: সংবাদপত্রে প্রকাশিত বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও শুদ্ধাচার চর্চায় ব্যত্যয়ের কিছু উদাহরণ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি	সততা ও সুনীতি চর্চায় ব্যত্যয়ের কিছু ধরণ
▪ জনবল সংকট (দৈনিক পূর্বদেশ, ০১.০৪.২০১৮) ▪ আধুনিক অস্ত্র ও যানবাহন সংকট (যুগান্তর, ০৬.০৮.২০১৭; সমকাল, ০৯.০৫.২০১৫) ▪ টহলযান ও জ্বালানি তেল সংকট (ইত্তেফাক, ২৯.০৯.২০১৫; সমকাল, ০৯.০৫.২০১৫) ▪ তথ্য প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগের অনুপস্থিতি (বণিক বার্তা, ১৬.০১.২০১৭) ▪ বনকর্মীদের ঝুঁকি ভাতা না থাকা (ইত্তেফাক, ২৯.০৯.২০১৫; যুগান্তর, ০৬.০৮.২০১৭) ▪ ব্যবহারের অনুপযোগী বন অফিস ও ফাঁড়ি (ইত্তেফাক, ২৯.০৯.২০১৫) ▪ বন বিভাগের অদক্ষতা (বণিক বার্তা, ১৬.০১.২০১৭) ▪ দুর্বল বন ব্যবস্থাপনা (বণিক বার্তা, ১৬.০১.২০১৭) ▪ অব্যবস্থাপনা (প্রথম আলো, ০৯.১২.২০১৯) ▪ অদক্ষতা (যুগান্তর, ১৯.০৬.২০১৯)	▪ বন আইন অবজ্ঞা (বণিক বার্তা, ১৬.০১.২০১৭) ▪ পরীক্ষা অনুপস্থিত থেকেও চাকরি প্রাপ্তি, মেধাবীদের নিয়োগ না দেওয়া (কালের কণ্ঠ, ২৮.০৭.২০১৬) ▪ বদলি-পদায়ন নিয়ে অধিদপ্তর, সার্কেল ও বিভাগ পর্যায়ে অর্থ লেনদেন (ইত্তেফাক, ২৯.০৯.২০১৫) ▪ নিজ জেলায় চাকরির/পদায়নের সুযোগ এবং প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তার (ইত্তেফাক, ২৯.০৯.২০১৫) ▪ সরকারি গাছের তালিকা প্রণয়ণে দুর্নীতি (বণিকবার্তা, ১১.১০.২০১৭) ▪ ইজারাদারের কাছ থেকে টাকা আদায় (সিটি নিজউ বিডি, অনলাইন, ১৭.১২.২০১৫) ▪ গাছ চোরদের সাথে যোগসাজশে বন উজাড় (বণিকবার্তা, ১৭.০৮.২০২০) ▪ দুর্নীতি ও অদক্ষতা (প্রথম আলো, ০৯.১২.২০১৯) ▪ উদাসীনতা ও দুর্নীতি (যুগান্তর, ১৯.০৬.২০১৯)

সংযুক্তি ৩

সারণি ১২: গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকা ও কার্যালয়সমূহ

ক্রমিক নম্বর	অঞ্চলিক অফিস/কার্যালয়	▪ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর/কার্যালয়	রেঞ্জ অফিস	বিট/ক্যাম্প/চেক স্টেশন
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল	▪ টাঙ্গাইল বন বিভাগ	৩টি	৩টি
		▪ ঢাকা বন বিভাগ, মহাখালী	১টি	২টি বিট ও একটি বিট কাম চেক স্টেশন
২	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, রাঙ্গামাটি	৫টি	-
		▪ রাঙ্গামাটি দক্ষিণ বন বিভাগ, রাঙ্গামাটি		
		▪ অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ বিভাগ, রাঙামাটি		
		▪ ঝুম নিয়ন্ত্রণ বন বিভাগ, রাঙ্গামাটি		
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	▪ কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার	৫টি	৭টি বিট, ১টি চেক স্টেশন
		▪ বান্দরবান বন বিভাগ, বান্দরবান		
		▪ পাল্পউড বন বিভাগ, বান্দরবান		
		▪ চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম		
৪	খুলনা অঞ্চল (ম্যানগ্রোভ বন)	▪ আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা	১টি	২টি টহল ফাঁড়ি
		▪ সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা		
		▪ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা		
		▪ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা		
৫	উপকূলীয় অঞ্চল	▪ উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী	-	১টি বিট
৬	সামাজিক বন অঞ্চল- ঢাকা	▪ সামাজিক বন অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী	৩টি	২টি বিট
৭	বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল	▪ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা		
		▪ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা		
৮	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর	-	-	-
মোট	৮টি	১৫টি	১৮টি	বিট (১৫টি); অন্যান্য (৪টি)

সংযুক্তি ৪: বন অধিদপ্তরের বর্তমান অর্গানোগ্রাম

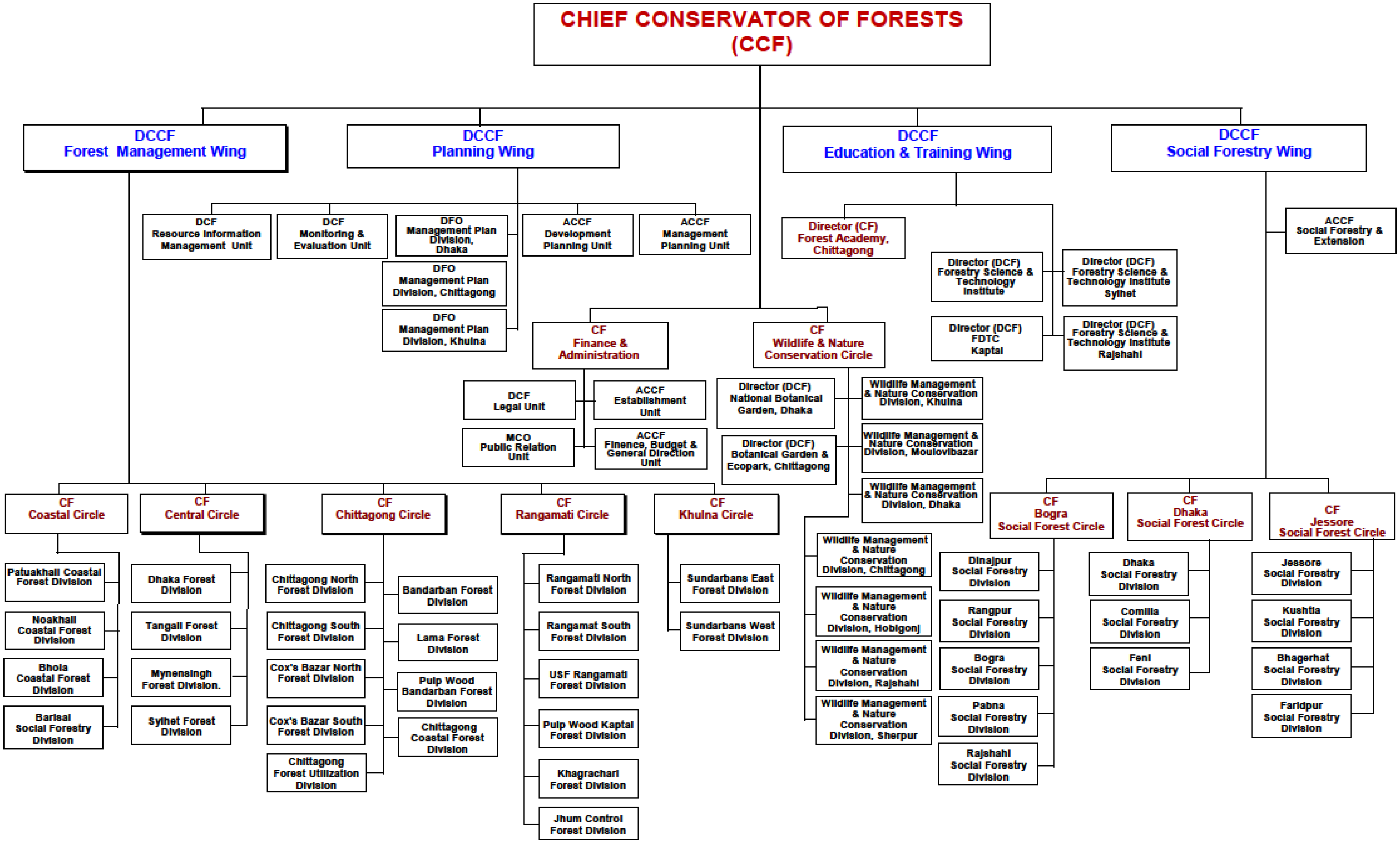

Abbreviations: DCCF - Deputy Chief Conservator of Forests, CF - Conservator of Forests, DCF - Deputy Conservator of Forest, DFO - Divisional Forest Officer, ACCF - Assistant Chief Conservator of Forest